সাহিত্য মালঞ্চ-৪

উচ্চমাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

দ্বাদশ শ্রেণি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশনা : অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ
(এস সি ই আর টি), ত্রিপুরা

সাহিত্য মালঞ্চ-৪

মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য সংকলন

দ্বাদশ শ্রেণি

গ্রন্থস্বত্ব : ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১৫
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০২০

প্রকাশক : অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষৎ (এস সি ই আর টি), ত্রিপুরা

সংকলন ও সম্পাদনা :
শ্রী শংকর বসু
ড. গীতা দেবনাথ
ড. স্মৃতি চক্রবর্তী
ড. নারায়ণ ভট্টাচার্য
ড. শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়
ড. স্বপন কুমার পোদ্দার
শ্রী নারায়ণ চন্দ্র শর্মা
শ্রী অনাদি চৌধুরী

প্রচ্ছদ ছবি : শ্রী কমল মিত্র

মূল্য : ২৪ টাকা

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

মুখবন্ধ

সমাজ জীবনের অগ্রগতি ও পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো শিক্ষাকাঠামো এবং শিক্ষাক্রমের রূপরেখারও পরিবর্তন হয়। পাঠক্রমের পরিকল্পনা আসলে অনেক বড়ো মাপের একটা পদ্ধতি। পরিবর্তিত শিক্ষাকাঠামো ও জাতীয় স্তরের সঙ্গো সাযুজ্য রেখে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির 'সাহিত্য মালঞ্চ' প্রকাশ করল।

দেশ-কাল-সমাজের সঙ্গো পাঠ্যবস্তুর নিগূঢ় সম্পর্ক আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেই শিক্ষার্থীর মনে জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়। এই জিজ্ঞাসা দিয়েই পরবর্তী কালে ছাত্রছাত্রীরা সাহিত্যপাঠে আরও বেশি অনুরাগী হবে। তাই ভাষার বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের উপযোগী, আত্মমর্যাদাবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সহায়ক রচনাগুলি পাঠ্যসূচির মধ্যে রাখার প্রয়াস করা হয়েছে।

সাহিত্যের চিরায়ত মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে শিক্ষার্থীদের যাতে আগ্রহ ও কৌতুহলের উদ্রেক হয় এমন রচনাগুলিই পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পঠনের ক্ষেত্র প্রসারিত করার লক্ষ্যে পাঠ্যতালিকা বাইরেও কিছু বাড়তি রচনা এই সংকলনে সংযোজিত হয়েছে। পূর্বতন লেখকদের বানানরীতিকে সম্মান-শ্রদ্ধা জানিয়েও বাংলা বানানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সমতা বিধানের প্রয়োজনে এই পাঠ্যপুস্তকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানরীতিকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের শাখা সংগঠন ইউনেস্কো বিশ্বের ভাষাগুলির মধ্যে কোন্ ভাষা কতখানি মাধুর্যমণ্ডিত তার সমীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, সেখানে কয়েক হাজার ভাষার দীর্ঘ তালিকায় শীর্ষস্থানে দেখানো হয়েছে বাংলা ভাষাকে। স্বভাবতই বাংলা ভাষা-সাহিত্য বিশ্বদরবারে নন্দিত ও বন্দিত। ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গো অনিবার্যভাবে জড়িত থাকে মানবিক বিকাশের ধারা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য,

কাজকর্মের গতি ও দক্ষতা। মাতৃভাষা দিয়েই ছাত্রছাত্রীরা চিন্তার নানা ব্যাপক এবং জটিল ক্ষেত্রে সাবলীলভাবে বিচরণ করতে পারে। কোন্ লেখকের কোন্ রচনাটি দ্বাদশ শ্রেণির উপযোগী হবে তা নির্ণয় করা খুব সহজ কাজ নয়। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সময়ের রচনা সংকলনের মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন, রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য অতি স্বল্প পরিসরে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে — যাতে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুচারুরূপে সমাধান করে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর পক্ষে সংকলকদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দ্বাদশ শ্রেণির 'সাহিত্য মালঞ্চ' সংকলনটি সুসমৃদ্ধ হয়েছে এমন দাবি করার অবকাশ নেই। প্রকাশিত পাঠ্যবইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষানুরাগীদের মতামত ও সুচিন্তিত পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সর্বশেষে, সংকলনটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই আমাদের এই প্রয়াস সর্বতোভাবে সার্থক হবে বলে মনে করি।

আগরতলা
ডিসেম্বর, ২০১৭

সভাপতি
ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ভারতের নাগরিকের মৌলিক অধিকার

(ভারতের সংবিধান, ধারা ১৪-৩০, ৩২ ও ২২৬)

সাম্যের অধিকার :

- আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারীপুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।
- সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার।
- অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ এবং আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।
- উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার অধিকার :

- বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
- শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
- সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার।
- ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
- ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার।
- যে-কোনো জীবিকা, পেশা বা ব্যবসাবাণিজ্য করার অধিকার।
- জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার :

- কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়, বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না।
- চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার :

- সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সমান নিরাপত্তা, কাউকে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না এবং প্রত্যেকেই ধর্মাচরণের পূর্ণ এবং সমান অধিকার পাবে।
- রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাতি বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না।
- ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার :

- ভারতের যে-কোনো নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে।
- ধর্ম, জাতি বা ভাষার দরুন কাউকে সরকারি অথবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
- প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার :

- মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে — প্রয়োজনে বিশেষ লেখ (Writ) জারি করতে পারবে;

  হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus), ম্যান্ডামাস (Mandamus), সারশিয়ো (Certiorari), প্রহিবিশান (Prohibition), ও কুয়ো ওয়ারান্টো (Quo-Warranto)।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতের সংবিধান, ধারা ৫১এ)

- সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ।
- মহৎ যেসব আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে তাদের লালন ও অনুসরণ।
- ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।
- আহ্বান এলে দেশরক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।
- ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল-শ্রেণি নির্বিশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্‌বোধন।
- দেশের মিশ্র সংস্কৃতির মূল্যবান উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও সংরক্ষণ।
- অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ।
- বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের বিকাশ।
- সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা।
- জাতি যাতে নিয়ত তার কর্মোদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছোতে পারে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রয়াসে উৎকর্ষের সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর প্রচেষ্টা।
- পিতা-মাতা / অভিভাবকের দায়িত্ব ৬-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

সূচিপত্র

কবিতা

নিবেদন	চণ্ডীদাস	৯
শিবের দক্ষালয় যাত্রা	ভারতচন্দ্র রায়	১০
আশা	নবীনচন্দ্র সেন	১১
সবুজের অভিযান*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২
কালবৈশাখী*	মোহিতলাল মজুমদার	১৫
নারী*	কাজী নজরুল ইসলাম	১৭
পাখিদের মন	প্রেমেন্দ্র মিত্র	২০
যুদ্ধ কেন?*	দিনেশ দাস	২১
আগামী*	সুকান্ত ভট্টাচার্য	২২
স্বাধীনতা তুমি	শামসুর রাহমান	২৩
জঙ্গালে যাবার	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	২৫
কেউ কথা রাখেনি	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	২৬

গদ্য

বাহুবল ও বাক্যবল*	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৮
কবিতা ও বিজ্ঞান*	জগদীশচন্দ্র বসু	৩২
মন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৪
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩৮
অন্নদাদিদি*	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৩
স্ত্রীজাতির অবনতি	বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন	৫১
সংস্কৃতি	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৪
যুগজিজ্ঞাসা*	অন্নদাশঙ্কর রায়	৬২
তিতাস	অদ্বৈত মল্লবর্মণ	৬৬

ছোটোগল্প

আপদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭২
শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড*	পরশুরাম	৮৪
মাসি-পিসি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১০২
অযান্ত্রিক*	সুবোধ ঘোষ	১১১
বিষফুল	সত্যজিৎ রায়	১২০
মধ্যরাতের ভয়ংকর	নবনীতা দেব সেন	১৩৫
গোলাপি ঘর	বাণী বসু	১৪৭

*চিহ্নিতকরণগুলি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।

নিবেদন

চণ্ডীদাস

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান।।
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনি হাম অতি দীনা
না জানি ভজন পূজন।।
পিরিতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়েছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়।।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।।
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালো মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণ খানি।।

শিবের দক্ষালয় যাত্রা

ভারতচন্দ্র রায়

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।।
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট সঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল কলক্কল্ তরঙ্গা।।
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফণ্ণ গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে।।
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে।।
দলম্মল্ দলম্মল্ গণ্ডে মুণ্ডমালা।
কটীকট্টসদ্যোমরা হস্তিছালা।।
পচা চর্ম্ম ঝুলি করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে।।
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গি উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে।।
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুংকারে হাঁকে উড়ে সর্পবাণা।।
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী।।
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।

চলে শাঁখিনি পেতিনি মুক্তকেশে।।
গিয়া দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে।।
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে।।
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে।।

আশা

নবীনচন্দ্র সেন

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন!
দুর্বল মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি, হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে;
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির-শোভা। পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস!

ধন্য, আশু কুহকিনি! তোমার মায়ায়
অসার সংসার চক্র ঘোরে নিরবধি!
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়!
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি।
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্তুল-আকার
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ; পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায়! অনিবার।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্বাচীন নরে।

সবুজের অভিযান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;
আর তো কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা,
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে-আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

বাহিরপানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে,
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে

মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়।
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে, এ কী বিষম কাণ্ডখানা!
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা।

শিকল-দেবীর ওই-যে পূজাবেদি
চিরকাল কি রইবে খাড়া!
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন! বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগি কর্ অবাধপানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে,

ঘুচিয়ে দে, ভাই পুথিপোড়োর কাছে
        পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
                আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
        জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
                প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
        আপন গলার বকুলমাল্যগাছা।
                আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।

কালবৈশাখী

মোহিতলাল মজুমদার

মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে!
ধরণির 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে!
কানন-আনন পাণ্ডুর করি
জলস্থলের নিশ্বাস হরি
আলয়ে-কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে!

আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ,
নিমেষ গনিছে তাই কি তাহারা সারি সারি নিস্পন্দ?
মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ
এখনি ব্যাকুলি তুলিয়াছে প্রাণ?
পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্রঘোষণ ছন্দ?

হেরি যে হোথায় আকাশকটাহে ধূম্র মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীমকুণ্ডল জটা!
অথবা ও কিরে সচল অচল —
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে, ছিঁড়িয়া রশ্মিছটা!

ওই শোনো তার ঘোর নির্ঘোষ, দুলিয়া উঠিল জটাভার।
শুরু হয়ে গেছে গুরু-গুরু রব —নাসা-গর্জন ঝঞ্ঝার।
পিঙ্গল হল গলতলদেশ,
ধূলিধূসরিত উন্মাদবেশ—
দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণিবন্ধন সন্ধ্যার।

অঙ্কুশ কার ঝলসিয়া ওঠে দিক হতে দিক-অন্তে!
দিগ্‌বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে নভ দন্তে।

বাজে ঘন ঘন রণদুন্দুভি,
ঝড়ে সে আওয়াজ কভু যায় ডুবি,
যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে!

বঙ্কিম-নীল অসির ফলকে দেহ হল কার ভিন্ন?
অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা কে করিল নিশ্চিহ্ন?
নেমে আসে যেন বাঁধ-ভাঙা জল,
ম্লান হয়ে আসে মেঘকজ্জল,
আলোকের মুখে কালো যবনিকা এতখনে হল ছিন্ন।

হেরো, ফিরে চলে সে রণবাহিনী বাজায়ে বিজয়শঙ্খ,
আকাশের নীল নির্মল হল — ধৌত ধরার পঙ্ক।
বায়ু বহে পুন মৃদু উচ্ছ্বাসে
নদী উথলিছে কুলুকুলু ভাষে,
আলো-ঝলমল বিটপীর দল নিশ্বসে নিঃশঙ্ক।

নববর্ষের পুণ্য-বাসরে কালবৈশাখী আসে।
হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যায় অদ্ভুত উল্লাসে।
ঝড়-বিদ্যুৎ বজ্রের ধনি —
দুয়ার জানালা উঠে ঝনঝনি —
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বুঝি, তবু প্রাণ ভরে আশ্বাসে।

চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি রস, মধু ভরি বুকে মৃত্তির,
সে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে —
শুনি টংকার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি — তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্তির।

এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি ধরায় ধরে না হর্ষ
ওরি মাঝে আছে কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ।
নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ কায়া,
নিশীথনীরব ঘনঘোর ছায়া —
ওরি মাঝে আছে নববিধানের আশ্বাস দুর্ধর্ষ।

নারী

কাজী নজরুল ইসলাম

সাম্যের গান গাই —
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী!
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা, করে নারী হেয়-জ্ঞান?
তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান।
অথবা পাপ যে—শয়তান যে—নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে!
এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছে তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান!
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।
পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ!
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে — নারী জোগায়েছে মধু!
শস্যক্ষেত্র উর্বর হল পুরুষ চালাল হল;
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।

নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শিষে।
স্বর্ণ-রৌপ্যভার
নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হয়েছে অলংকার!
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার, হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে!
জগতের যত বড়ো বড়ো জয়, বড়ো বড়ো অভিযান,
মতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে!
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়-লক্ষ্মী নারী!
রাজা করিয়াছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিল রানি,
রানির দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি!

পুরুষ হৃদয়-হীন,
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।
ধরায় যাঁদের যশ ধরে না ক' অমর মহামানব,
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,
খেয়ালের বসে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা।
লব কুশে বনে ত্যাজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।
নারী সে শিখাল শিশু-পুরুষেরে স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,
দীপ্ত নয়নে পরাল কাজল বেদনার ঘন ছায়া।
অদ্ভুত রূপে পরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,

বুকে করে তারে চুমিল যে, তারে করিল সে অবরোধ!
তিনি নর-অবতার —
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি কুঠার!
পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর,
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর!
সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে-যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক', নারীরা আছিল দাসী!
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দি কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি,
নর যদি রাখে নারীরে বন্দি, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ওই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!

যুগের ধর্ম এই
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!

শোনো মর্ত্যের জীব,
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব!
স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকারের যক্ষপুরীতে নারী,
করিল তোমায় বন্দিনি, বলো কোন্ সে অত্যাচারী!
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সে ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা!
চোখে চোখে আজি চাহিতে পারো না; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেলো নারী, ভেঙে ফেলো ও শিকল!
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ!

ধরার দুলালি মেয়ে
ফির'না ত আর গিরিদরীবনে শাখী-সনে গান গেয়ে!

কখন আসিল 'প্লুটো' যমরাজা নিশীথ পাখায় উড়ে,
ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে!
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হতে আছ মরি!
মরণের পুরে; নামিল ধরায় সেইদিন বিভাবরী।
ভেঙে যমপুরী নাগিনির মতো আয় মা পাতাল ফুঁড়ি!
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি!
পুরুষ যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও পদাঘাতে
লুটায়ে পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে!
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, সে-হাতে কূট বিষ দিতে হবে!
সে-দিন সুদূর নয় —
যে-দিন ধরণি পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!

পাখিদের মন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন।
আর শুধু মাটি নয়, শস্য নয়,
নয় শুধু ভার,
আর-এক বিদ্রোহী ধিক্কার —
পৃথিবী-পরাস্ত-করা উজ্জ্বল উৎক্ষেপ।
আজো এরা মাঠে-ঘাটে মাটি খুঁটে খায়,
মেনে নেয় সবকিছু দায়;
তবু এক সুনীল শপথ
তাদের বুকের রক্ত তপ্ত করে রাখে।
জীবনের বাঁকে বাঁকে, যত গ্লানি যত কোলাহল
ব্যাধের গুলির মতো বুকে বিঁধে রয়,
সে-উত্তাপে গলে গিয়ে হয়ে যায় ক্ষয়।
শুধু দুটি তীব্র তীক্ষ্ণ দুঃসাহসী ডানা,
আকাশের মানে না সীমানা।
কোনোদিন এ-হৃদয় হয় যদি একান্ত নির্জন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন
—আয় এক সূর্য সচেতন।

যুদ্ধ কেন?

দিনেশ দাস

পৃথিবী অনেক বড়ো — এখনে ক-কেটি লোক
তবুও লড়াই করে যত আহাম্মক
স্থান আরো চাই—
যুদ্ধ বাধে আর ওড়ে মৃত্যুর হাওয়াই।

আজকে আকাশ জুড়ে মহাসমরের মহামারি
এই যুদ্ধে আমরা আজ জিতি কিংবা হারি
এ কথা চরমতম নয় :
আজকে আমার প্রশ্ন,
কেন হবে বারবার বর্বর এই অভিনয়?

আহাম্মকের ক্রূর আকাঙ্ক্ষায়,
এ পৃথিবী বারবার চিড় খায় ট্যাংকের চাকায়,
ফাটা রেকর্ডের মতো পৃথিবীটা ঘুরে চলে —
আমার গানের পিন বেধে গেছে হঠাৎ ফাটলে,
বারে বারে ঘুরে ঘুরে একঘেয়ে এক কথা কয়
কেন হবে বারবার বর্বর এই অভিনয়?

পৃথিবী অনেক বড়ো
জলাভূমি মাঠ করো
জঙ্গল হাঁসিল হ'ক ভেঙেচুরে পিষে।
প্যারাস্যুটে নেমে পড়ো
মেরুতে বসতি করো
বীজ বোনো কিরঘিজ স্টেপিসে :

পৃথিবী অনেক বড়ো —
বিজ্ঞানের তাপ নয়, আলো তুলে ধরো।

আগামী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা;
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় :
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়;
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে;
জয়ধ্বনি কিশলয়ে : সংবর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই — জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো; হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।।

স্বাধীনতা তুমি

শামসুর রাহমান

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা —
স্বাধীনতা তুমি
শহিদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।

স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখির দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি
পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদির রং।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকির অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসি বটের ঝিলমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

জঙ্গালে যাবার

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

জঙ্গালে যাবার কোনো দিনক্ষণ নির্ধারিত নেই,
যে-কোনো সময়ে তুমি জঙ্গালের মধ্যে যেতে পরো।
পাতা কুড়োতেই যাও, কিংবা দিতে কুঠারের ঘা,
জঙ্গালে যাবার জন্যে অকৃপণ নিমন্ত্রণ আছে।
জঙ্গালে চাঁদের সঙ্গে হেঁটে গেছো কখনও জ্যোৎস্নায়?
পাতার করাতে চাঁদ ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছো কি?
ফুটবলের মতো চাঁদ পড়ে আছে টিলার উপরে —
কখন, গভীর রাতে খেলা হবে, জয়োল্লাস হবে —
এসব মুহূর্তে তুমি জঙ্গালের মধ্যে যেতে পারো।।

কেউ কথা রাখেনি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনি গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে
তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টুমি
আর এল না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামা বাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড়ো হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাব
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে!
নাদের আলি, আমি আর কত বড়ো হব? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে?
একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনও
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারির মতন চৌধুরিদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ-কঙ্কন-পরা ফর্সা রমণীরা
কত রকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি!
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমারও ...

বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না!

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এ-রকম আতরের গন্ধ হবে!
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখন তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনও সে যে-কোনো নারী!
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখে না!

বাহুবল ও বাক্যবল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাক্যবল কাহাকে বলি, তাহা প্রথমে বুঝাইব। তৎপর এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব। এবং এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব।

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বলে ব্যাঘ্র হরিণশিশুকে হনন করিয়া ভোজন করে, আর যে বলে অস্তলিজ বা সেডান জিত হইয়াছিল, তাহা একই বল; দুইই বাহুবল। আমি লিখিতে লিখিতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটি টিকটিকি একটি মক্ষিকা ধরিয়া খাইল — সিসস্ত্রিস হইতে আলেকজণ্ডর রমানফ পর্যন্ত যে যত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে — রোমান বা মাকিদনীয়, খস্রু বা খলিফা, বুশ বা প্রুশ যিনি যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার বল, আর এই ক্ষুধার্ত টিকটিকির বল, একই বল — বাহুবল। সুলতান মোহম্মদ সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া গেল — আর কালামুখী মার্জারী ইঁদুর মুখে করিয়া পালাইল — উভয়েই বীর — বাহুবলে বীর। সোমনাথের মন্দিরে, আর আমার বস্ত্রচ্ছেদক ইন্দুরে প্রভেদ অনেক স্বীকার করি; — কিন্তু মোহম্মদের লক্ষ সৈনিকে, আর একা মার্জারীতেও প্রভেদ অনেক। সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ — বীর্যে প্রভেদ বড়ো দেখি না। সাগরও জল — শিশিরবিন্দুও জল। মোহম্মদের বীর্য ও টিকটিকি-বিড়ালের বীর্য, একই বীর্য। দুই-ই বাহুবলের বীর্য। পৃথিবীর বীরপুরুষগণ ধন্য ! এবং তাঁহাদিগের গুণকীর্তনকারী ইতিবৃত্ত লেখকগণ — হেরোডোটস হইতে কে ও কিঙলেক সাহেব পর্যন্ত — তাঁহারাও ধন্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন না যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোনো সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই — কেবল বাহুবলে পাণিপাত সেডান জিত হয় নাই। — কেবল বাহুবলে নাপোলেয়ন বা মার্লবর বীর নহে। স্বীকার করি, কিছু কৌশল — অর্থাৎ বুদ্ধিবল — বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে কার্যকারিতা ঘটে না। কিন্তু ইহা কেবল মনুষ্যবীরের কার্য নহে — কেন কি মনে করো যে, বিনা কৌশলে টিকটিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইঁদুর ধরে? বুদ্ধিবলের সহযোগ ভিন্ন বাহুবলের স্ফূর্তি নাই — এবং বুদ্ধি ব্যতীত জীবের কোনো বলেরই স্ফূর্তি নাই।

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে বলে পশুগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে প্রধানত স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল। প্রকৃতপক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কার্যে সর্বক্ষম, এবং

সর্বত্রই শেষ নিষ্পত্তিস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না — তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না — এমত প্রস্তর নাই যে আঘাতে ভাঙে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত — সকল আপিলের উপর আপিল এইখানে; ইহার উপর আর আপিল নাই। বাহুবল — পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। পশুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয় — মনুষ্যের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদরপূর্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পূর্বে প্রয়োগ-সম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ, কোনো সিংহ কর্তৃক বন্য পশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সঙ্গো বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই — একটি একটি পশু প্রত্যহ তাঁহার আহারের জন্য উপস্থিত হইবে। এস্থলে পশুগণ সমাজনিবন্ধ মানুষ্যের ন্যায় আচরণ করিল, — সিংহ কর্তৃক বাহুবলের নিত্যপ্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। এবং সামাজিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারে। রাজা মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবল প্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে, এই এক লক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব প্রজা বাহুবল প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখিয়া রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। এদিকে এই এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ। প্রজার অর্থ যে রাজার কোশগত বা প্রজার অনুগ্রহ যে তাঁহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল। অতএব এস্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না, তাঁহার মুখ্য কারণ মানুষ্যের দুরদৃষ্টি, গৌণ কারণ সমাজবন্ধন।

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজনিবন্ধ না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাহুবল প্রযুক্ত হইবে — এই বিশ্বাসই বাহুবল প্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মনুষ্যের দূরদৃষ্টি সকল

সময়ে সমান নহে — সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক সময়েই যাঁহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা। তাঁহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাঁহাকে বুঝে। বুঝে যে, যদি আমরা এই সময়ে কর্তব্য সাধন করি, তবে আমাদিগের উপর বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা। বুঝে যে, বাহুবল প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত পথগামী, তাহারা গন্তব্য পথে গমন করে।

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ। যখন রাজা প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া সহজে নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে। কখনও কখনও রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ কর্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন।

ইংলন্ডের প্রথম চার্লস যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে অবগত আছেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জেমস, বাহুবল প্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই দেশ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট। অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, কোনো কার্যে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে-কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭/৫৮ সালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাঁহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি প্রজার সঙ্গো বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। অতএব তাঁহারা বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গতি করেন না।

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল মনুষ্যসংহার প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতে, বাহুবলের কার্য সিদ্ধ করে। অতএব এই বাক্যবল কী এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কী প্রকার, তাহা বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া কর্তব্য। বিশেষত এতদ্দেশে। অস্মদ্দেশে বাহুবল প্রয়োগের কোনো সম্ভাবনা নাই — বর্তমান অবস্থায় অকর্তব্যও বটে। সামাজিক অত্যাচার নিবারণে বাক্যবল একমাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির প্রয়োজন।

বস্তুত বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে — যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প

যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক — দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বলী।

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের পরিণাম বা তদর্থেই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতক দূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও, সৎকর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখনও এককালে কোনো বিশেষ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তবে সে সৎকার্য অবশ্যই অনুষ্ঠিত হয়। এই সৎপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও-কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ; চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়ঙ্গমতা হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদগত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না — তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশবাক্যবলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে এইরূপ যাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন — বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ কর্তৃক তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোনো সমাজের ইষ্টসাধন হয় না, এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকার প্রধান উন্নতিসাধনকর্তা বাহুবলবীর ওয়াশিংটন। হলান্ড বেলজিয়মের প্রধান উন্নতিসাধনকর্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জের উইলিয়ম। ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ — বাহুবলের অভাব। কিন্তু মোটের ওপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। বাহুবল পশুর বল — বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলো বকিতে পারিলেই বাক্যবল হয় না। — বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ত্বসকল মনোমধ্য হইতে উদ্ভূত করেন — বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি।

অনেক সময়েই এই বল একাধারে নিহিত — কখনো-কখনো বলের আধার পৃথকভূত। একত্রিত হউক, পৃথকভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল।

(সংক্ষেপিত)

কবিতা ও বিজ্ঞান

জগদীশচন্দ্র বসু

পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষপর্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপরদিকে, বহুর মধ্যে যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেইদিকে সর্বদা লক্ষ রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই একেকে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোনো প্রবল বাধা ঘটে না।

ফলত, জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কী চাহিতেছি, কী ভাবিতেছি, কী পরীক্ষা করিতেছি তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব।

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখনেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায়, সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব- ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিদ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া, এক-এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন, মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না। এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে-পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি একদিকের কথা কোনোমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে, তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি দাবি করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখনও কোনো অংশে দুর্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসংবরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন 'যেন' নহে — এই সেই।

মন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই-যে মধ্যাহ্নকালে নদীর ধারে পাড়াগাঁয়ের একটি একতলা ঘরে বসিয়া আছি; টিকটিকি ঘরের কোণে টিকটিক করিতেছে; দেয়ালে পাখা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে একজোড়া চড়ুই পাখি বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইয়া কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচমিচ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে; নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, উচ্চতটের অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে; বাতাসটি স্নিগ্ধ, আকাশটি পরিষ্কার, পরপারের অতিদূর তীররেখা হইতে আর আমার বারান্দার সম্মুখবর্তী বেড়া-দেওয়া ছোটো বাগানটি পর্যন্ত উজ্জ্বল রৌদ্রে একখণ্ড ছবির মতো দেখাইতেছে — এই তো বেশ আছি। মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া একটি জীবনপূর্ণ আদরপূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দিক হইতে আমার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। তবে এইভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কী! কাগজ-কলম লইয়া বসিবার জন্য কে তোমাকে খোঁচাইতেছিল। কোন্ বিষয়ে তোমার কী মত, কীসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি, সেকথা হইয়া হঠাৎ ধুমধাম করিয়া কোমর বাঁধিয়া বসিবার কী দরকার ছিল। ওই দেখো, মাঠের মাঝখানে, কোথাও কিছু নাই, একটা ঘূর্ণাবাতাস খানিকটা ধুলা এবং শুকনো পাতার ওড়না উড়াইয়া কেমন চমৎকারভাবে ঘুরিয়া নাচিয়া গেল। পদাঙ্গুলিমাত্রের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভঙ্গিটি করিয়া মুহূর্তকাল দাঁড়াইল, তাহার পর হুস্‌হাস্ করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। সম্বল তো ভারী! গোটাকতক খড়কুটা ধুলাবালি সুবিধামতো যাহা হাতের কাছে আসে তাহাই লইয়া বেশ একটু ভাবভঙ্গি করিয়া কেমন একটি খেলা খেলিয়া লইল। এমনি করিয়া জনহীন মধ্যাহ্নে সমস্ত মাঠময় নাচিয়া বেড়ায়। না আছে তাহার কোনো উদ্দেশ্য, না আছে তাহার কেহ দর্শক, না আছে তাহার মত, না আছে তাহার তত্ত্ব, না আছে সমাজ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অতি

সমীচীন উপদেশ — পৃথিবীতে যাহা-কিছু সর্বাপেক্ষা অনাবশ্যক, সেই-সমস্ত বিস্মৃত পরিত্যক্ত পদার্থগুলির মধ্যে একটি উত্তপ্ত ফুৎকার দিয়া তাহাদিগকে মুহূর্তকালের জন্য জীবিত জাগ্রত সুন্দর করিয়া তোলে।

অমনি যদি অত্যন্ত সহজে এক নিশ্বাসে কতকগুলো যাহা-তাহা খাড়া করিয়া সুন্দর করিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া লাটিম খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম। অমনি অবলীলাক্রমে সৃজন করিতাম, অমনি ফুঁ দিয়া ভাঙিয়া ফেলিতাম। চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, লক্ষ্য নাই; শুধু একটা নৃত্যের আনন্দ, শুধু একটা সৌন্দর্যের আবেগ, শুধু একটা জীবনের ঘূর্ণা। অবারিত প্রান্তর, অনাবৃত আকাশ, পরিব্যাপ্ত সূর্যালোক — তাহারই মাঝখানে মুঠা মুঠা ধূলি লইয়া ইন্দ্রজাল নির্মাণ করা, সে কেবল খ্যাপা হৃদয়ের উদার উল্লাসে।

এ হইলে তো বুঝা যায়। কিন্তু বসিয়া বসিয়া পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া গলদঘর্ম হইয়া কতকগুলা নিশ্চল মতামত উচ্চ করিয়া তোলা! তাহার মধ্যে না আছে গতি, না আছে প্রীতি, না আছে প্রাণ। কেবল একটা কঠিন কীর্তি। তাহাকে কেহ-বা হাঁ করিয়া দেখে, কেহ-বা পা দিয়া ঠেলে — যোগ্যতা যেমনি থাক।

কিন্তু ইচ্ছা করিলেও এ কাজে ক্ষান্ত হইতে পারি কই। সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।

লিখিতে লিখিতে আমি বাইরে চাহিয়া দেখিতেছি, ওই একটি লোক রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শালপাতের ঠোঙায় খানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে। ওটি আমার ভৃত্য, নাম নারায়ণ সিং। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত প্রফুল্লচিত্ত। উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠালগাছটির মতো। এইরূপ মানুষ এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত ঠিক মিশ খায়। প্রকৃতি এবং ইহার মাঝখানে বড়ো একটা বিচ্ছেদচিহ্ন নাই। এই জীবধাত্রী শস্যশালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গাসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ বিসংবাদ নাই। ওই গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যন্ত কেবল একটি আতাগাছ হইয়া উঠিয়াছে তাহার আর কিছুর জন্য কোনো মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুস্ট নারায়ণ সিংটিও তেমনি আদ্যোপান্ত কেবল একখানি আস্ত নারায়ণ সিং।

কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ওই আতাগাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়, তবে ওই সরস শ্যামল দারুজীবনের মধ্যে কী

এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়। তবে চিন্তায় উদার চিকন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠে এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মতো কুঞ্চিত হইয়া আসে। তখন বসন্তকালে আর কি অমন দুই-চারিদিনের মধ্যে সর্বাঙ্গ কচিপাতায় পুলকিত হইয়া উঠে; বর্ষাশেষে ওই গুটি-আঁকা গোল গোল গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে প্রত্যেক শাখা আর কি ভরিয়া যায়। তখন সমস্ত দিন এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে, "আমার কেবল কতকগুলা পাতা হইল কেন, পাখা হইল না কেন। প্রাণপণে সিধা হইয়া এত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তবু কেন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইতেছি না। ওই দিগন্তের পরপারে কী আছে; ওই আকাশের তারাগুলি যে-গাছের শাখায় ফুটিয়া আছে সে গাছ কেমন করিয়া নাগাল পাইব। আমি কোথা হইতে আসিলাম কোথায় যাইব, এ কথা যতক্ষণ না স্থির হইবে ততক্ষণ আমি পাতা ঝরাইয়া, ডাল শুকাইয়া, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে থাকিব। আমি আছি অথবা আমি নাই, অথবা আমি আছিও বটে নাইও বটে, ওই প্রশ্নের যতক্ষণ মীমাংসা না হয় ততক্ষণ আমার জীবনে কোনো সুখ নাই। দীর্ঘ বর্ষার পর যেদিন প্রাতঃকালে প্রথম সূর্য ওঠে সেদিন আমার মজ্জার মধ্যে যে একটি পুলকসঞ্চার হয় সেটা আমি ঠিক কেমন করিয়া প্রকাশ করিব এবং শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি যেদিন হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস ওঠে, সেদিন ইচ্ছা করে — কী ইচ্ছা করে কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে।"

এই সমস্ত কাণ্ড! গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা বেশি হইবার চেষ্টা করিয়া, যেরকম আছে আর -একরকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এদিক , না হয় ওদিক। অবশেষে একদিন হঠাৎ অন্তর্বেদনায় গুঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয় — একটা সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, অরণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্মর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্বাঙ্গব্যাপ্ত সরল সম্পূর্ণতা।

যদি কোনো প্রবল শয়তান সরীসৃপের মতো লুকাইয়া মাঠির নীচে প্রবেশ করিয়া শতলক্ষ আঁকাবাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা-তৃণগুল্মের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোথায় জুড়াইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া পাখির গানের মধ্যে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সবুজপত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিকপত্র সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপণ ঝুলিতে দেখা যায় না।

ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই। ভাগ্যে ধুতুরাগাছ কামিনীগাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না "তোমার ফুলের কোমলতা আছে কিন্তু ওজস্বিতা নাই" এবং কুলফল কাঁঠালকে বলে না "তুমি আপনাকে বড়ো মনে করো কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কুষ্মাণ্ডকে ঢের উচ্চ আসন দিই।" কদলী বলে না "আমি সর্বাপেক্ষা অল্পমূল্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্র প্রচার করি" এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎ পত্রের আয়োজন করে না!

তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মানুষ উদার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তারেখাহীন জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ললাট দেখিয়া, অরণ্যের ভাষাহীন মর্মর ও তরঙ্গের অর্থহীন কলধ্বনি শুনিয়া, এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া তবে কতকটা স্নিগ্ধ ও সংযত হইয়া আছে। ওই একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ নিবৃত্তি করিবার জন্য এই অনন্তপ্রসারিত অমনঃসমুদ্রের প্রশান্ত নীলাম্বুরাশির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আসল কথা পূর্বেই বালিয়াছি, আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। খাইবার পরিবার, জীবনধারণ করিবার, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক, মনটা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বড়ো হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দিকে অনেকখানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বসিয়া বসিয়া ডায়ারি লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তোলে, যাহাকে একভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর-এক ভাবে দাঁড় করায়, যাহা কোনোকালে কিছুতেই বোঝা যায় না অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে, এমনকি এ-সকল অপেক্ষাও অনেক গুরুতর গর্হিত কাজ করে।

কিন্তু, আমার ওই অনতিসভ্য নারায়ণ সিং-এর মনটি উহার শরীরের মাপে; উহার আবশ্যকের গায়ে-গায়ে ঠিক ফিট করিয়া লাগিয়া আছে। উহার মনটি উহার জীবনকে শীতাতপ অসুখ অস্বাস্থ্য এবং লজ্জা হইতে রক্ষা করে, কিন্তু যখন-তখন ঊনপঞ্চাশ বায়ু-বেগে চতুর্দিকে উড়ু-উড়ু করে না। এক-আধটা বোতামের ছিদ্র দিয়া বাহিরের চোরা হাওয়া উহার মানস-আবরণের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে কখনো একটু-আধটু স্ফীত করিয়া তোলে না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ততটুকু মনশ্চাঞ্চল্য তাহার জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই আবশ্যক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রথমেই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিব কি না, সেই ঘোর সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রকাণ্ড মানবতাকে সংকীর্ণ বাঙালিত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতে তাঁহার স্বজাতি তাঁহার নিকট আপনার যে মূর্তি দেখাইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনকাহিনি-পাঠে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণের সম্পর্কে আসিয়া তাঁহাকে যে পদে পদে লজ্জিত ও প্রতারিত হইতে হইয়াছে, ইহার ভুরিভুরি উদাহরণ তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকামধ্যে সংকলিত আছে। যদি কোনো বৈদেশিক আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি আঁকিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহাকে মসিবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিতলেখকগণ প্রচুর-পরিমাণে ওই সকল সামগ্রী একাধারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোটো জিনিসকে বড়ো করিয়া দেখায়; বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ওই উদ্দেশ্যে নির্মিত কোনো যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ওই গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙালিত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতিক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। দুই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলপর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

পূর্বেই বলিয়াছি, অনর্থক আত্মগ্লানির অবতারণা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে আপনার বলিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলে তুলনায় আত্মগ্লানি আপনা হইতে

আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণীসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের আত্মনির্ভর শক্তির প্রধান পরিচয় বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভর শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

আমরা যে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে দাঁড়াইতে সংকুচিত হই, এইরূপে তাহার কতকটা সান্ত্বনা মিলিতে পারে; কিন্তু এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মুনষ্যের কীরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নতি মস্তক, যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল; বঙ্গাদেশে তাঁহার আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্দ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে; আমাদের মতো যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কীরূপে মিলল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

সেইজন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে মনে দ্বিধা জন্মে। অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্য-জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকটে নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্র গঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতা-পিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শ্রেণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদায় বিপত্তি ছিন্নভিন্ন করিয়া, তিনি বীরের মতো সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কন্টক-সমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে, অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙালির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালি ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই।

তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে -স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্যভাবের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনোরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্বেই সম্যকভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর নতুন মশলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের খেতে যবের শিষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশোলার ন্যায় বিকট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরেজি একেবারে না শিখিতেন, বা ইংরেজের স্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা শহরের অবস্থাটা ঠিক এমন না হইতেও পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লিগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন, সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙালিটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালিটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখনও প্রয়োজন হয় নাই; এমনকি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্র মূর্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে-সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখনও ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

তাঁহার খাঁটি দেশীয় পরিচ্ছদ হইতেই তাহার উত্তর মিলিতে পারে। চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চুটিজুতাকে উপলক্ষ্য-মাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও তিনি মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

আচার বিষয়ে অন্যে র অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই-একটা পদার্থ ছিল, যাহাতে পাশ্চাত্য মানব হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল; এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়া আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।

বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনোরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমনকি, তিনি হিতৈষণাবশে যে-সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোনো স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক, তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া থাকিতে পরিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে, কী অপকার হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কী অনিষ্ট হইবে, নীততত্ত্ব-ঘটিত ও সমাজতত্ত্বে-ঘটিত এই সমকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন; পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত্র অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোনো একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর

কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোনো দীন-দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোনো বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষস্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মতো উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মতো কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়োই গর্হিত কর্ম; বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। সমাজসংস্কারের কথাটা উত্থাপন করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে যদি নিতান্ত আতঙ্ক জন্মে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের নিকট মার্জনার ভিখারি হইতেছি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া কথাটা একেবারে না তুলিলেও চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথ-প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। সম্ভবতই এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানবনির্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত; দুর্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের তো আর অভাব নাই; তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝার ভার চাপায়? ইহা তিনি বুঝিতেন না এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বালবিধবার দুঃদর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল এবং সেই বিগলিত হৃদেয়র প্রস্রবণ হইতে করুণা-মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরধুনী যখন ভূমিপৃষ্টে অবতরণ করেন, তখন কার সাধ্য যে, সে-প্রবাহ রোধ করে। বিদ্যাসাগরের কুরণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই, সেই মেরুদণ্ড নমিত করেন।

(সংক্ষেপিত)

অন্নদাদিদি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে শুনিতে ইন্দ্রর দিদি হঠাৎ বার-দুই এমনি শিহরিয়া উঠিলেন যে, ইন্দ্রর সেদিকে যদি কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত, সে আশ্চর্য হইয়া যাইত। সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি পাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সস্নেহে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিলেন, ছি দাদা, এমন কাজ আর কখ্খনো করো না। এসব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা করতে আছে ভাই ? ভাগ্যে তোমার হাতের ডালাটায় ছোবল মেরেছিল, না হলে আজ কী কাণ্ড হত বলত ?

আমি কি তেমনি বোকা দিদি! বলিয়া ইন্দ্র সপ্রতিভ হাসিমুখে ফস করিয়া তাহার কোঁচার কাপড়টা টানিয়া ফেলিয়া কোমরে সুতা-বাঁধা কী একটা শুকনা শিকড় দেখাইয়া বলিল, এই দ্যাখো দিদি, আট-ঘাট বেঁধে রেখেছি কিনা! এ না থাকলে কি আর আজ আমাকে না ছুবলে ছেড়ে দিত ? শাহ্জির কাছে এটুকু আদায় করতে কি আমাকে কম কষ্ট পেতে হয়েছে ? এ সঙ্গে থাকলে কেউ তো কামড়াতে পারেই না; আর তাই যদি বা কামড়াত — তাতেই বা কী! শাহ্জিকে টেনে তুলে তক্ষুণি বিষ-পাথরটা ধরিয়ে দিতুম। আচ্ছা দিদি, ওই বিষ-পাথরটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পারে ? আধ ঘণ্টা ? না অতক্ষণ লাগে না, না দিদি ?

দিদি কিন্তু তেমনি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, আজ দাও না দিদি আমাকে একটি। তোমাদের ত দুটো-তিনটে রয়েছে — আর আমি কতদিন ধরে চাইচি। বলিয়া সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, আমাকে তোমরা যা বলো আমি তাই করি — আর তোমরা কেবল পট্টি দিয়ে আমাকে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু — যদি নাই দেবে তবে বলে দাও না কেন ? আমি আর আসব না — যাও।

ইন্দ্র লক্ষ করিল না, কিন্তু আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অনুভব করিলাম যে, তাঁর মুখখানি কীসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ

হইয়া গেলে! কিন্তু পরক্ষণের জোর করিয়া একটুখানি হাসির ভাব সেই শীর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠাধারে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, হাঁ রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়িতে শুধু সাপের মন্তর আর বিষ-পাথরের জন্যেই আসিস রে?

ইন্দ্র অসংকোচে বলিয়া বসিল, তবে না তো কী! নিদ্রিত শাহ্‌জিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, কিন্তু কেবলই আমাকে ভোগা দিচ্চে — এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়, সেই যে কবে শুধু হাতচালার মন্তরটুকু দিয়েছিল আর দিতেই চায় না। কিন্তু আজ আমি টের পেয়েছি দিদি, তুমিও কম নয়, তুমিও সব জানো। ওকে আর আমি খোশামোদ করচি নে দিদি, তোমার কাছ থেকেই সমস্ত মন্তর আদায় করে নেব। বলিয়াই আমার প্রতি চাহিয়া, সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শাহ্‌জিকে উদ্দেশ করিয়া গভীর সম্ভ্রমের সহিত কহিল, শাহ্‌জি গাঁজা-টাঁজা খান বটে, শ্রীকান্ত, কিন্তু তিন দিনের বাসিমড়া আধঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন — এত বড়ো ওস্তাদ উনি! হাঁ দিদি, তুমিও মড়া বাঁচাতে পারো?

দিদি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া সহসা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! সে কী মধুর হাসি! অমন করিয়া হাসিতে আমি আজ পর্যন্ত কম লোককেই দেখিয়াছি। কিন্তু সে যেন নিবিড় মেঘভরা আকাশের বিদ্যুৎ-দীপ্তির মতো পরক্ষণেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু ইন্দ্র সেদিক দিয়াই গেল না। বরঞ্চ একেবারে পাইয়া বসিল। সেও হাসিয়া কহিল, আমি জানি, তুমি সব জানো। কিন্তু আমাকে একটি একটি করে তোমাকে সব বিদ্যে দিতে হবে, তা বলে দিচ্চি! আমি যতদিন বাঁচব, তোমাদের এক্কেবারে গোলাম হয়ে থাকব। তুমি কটা মড়া বাঁচিয়েছ দিদি?

দিদি কহিলেন, আমি তো মড়া বাঁচাতে জানিনে ইন্দ্রনাথ!

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, তোমাকে এ মন্তর শাহ্‌জি দেয়নি? দিদি ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিলে, ইন্দ্র মিনিট-খানেক তাঁর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া নিজেই তখন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, এ বিদ্যে কি কেউ শিগগির দিতে চায় দিদি! আচ্ছা কড়ি-চালাটা নিশ্চয়ই শিখে নিয়েচ, না?

দিদি বলিলেন, কাকে কড়ি-চালা বলে, তাই তো জানিনে ভাই।

ইন্দ্র বিশ্বাস করিল না। বলিল, ইস! জানো না বই-কি! দেবে না, তাই বলো। আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কড়ি-চালা কখনও দেখেছিস শ্রীকান্ত? দুটি কড়ি মন্তর পড়ে

ছেড়ে দিলে তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কামড়ে ধরে সাপটাকে দশ দিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির করে দেয়। এমনি মন্তরের জোর! আচ্ছা দিদি, ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধুলো-পড়া এসব জানো তো? আর যদিই নাই জানবে তো অমন সাপটাকে ধরে দেবে কী করে? বলিয়া সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দিদির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দিদি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া মনে মনে কী যেন চিন্তা করিয়া লইলেন; শেষে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ইন্দ্র, তোর দিদির এসব কানাকড়ির বিদ্যেও নেই। কিন্তু কেন নেই, সে যদি তোরা বিশ্বাস করিস ভাই, তা হলে আজ তোদের কাছে আমি সমস্ত ভেঙে বলে আমার বুকখানা হালকা করে ফেলি। বল্, তোরা আমার সব কথা আজ বিশ্বাস করবি? বলিতে বলিতেই তাঁহার শেষের কথাগুলি কেমন একরকম যেন ভারী হইয়া উঠিল।

আমি নিজে এতক্ষণ প্রায় কোনো কথাই কহি নাই। এইবার সর্বাগ্রে জোর করিয়া বলিয়া উঠিলাম, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি! সব — যা বলবে সমস্ত। একটি কথাও অবিশ্বাস করব না।

তিনি আমার প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করবে বই কি ভাই! তোমরা যে ভদ্রলোকের ছেলে। যারা ইতর, তারাই শুধু অজানা অচেনা লোকের কথায় সন্দেহে ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া আমি তো কখনও মিথ্যে কথা কইনে ভাই! বলিয়া তিনি আর একবার আমার প্রতি চাহিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিলেন।

তখন সন্ধ্যার ঝাপসা কাটিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং তাহারই অস্ফুট কিরণরেখা গাছের ঘনবিন্যস্ত ডাল ও পাতার ফাঁক দিয়া নীচের গাঢ় অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া, দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইন্দ্রনাথ, মনে করেছিলুম আজই আমার সমস্ত কথা তোমাদের জানিয়ে দেব! কিন্তু ভেবে দেখছি, এখনও সে সময় আসেনি। আমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস কোরো ভাই, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহ্‌জির পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়ো না। আমরা তন্ত্রমন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কী-না জানিনে, কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষমতাই নেই।

কী জানি কেন আমি এই অত্যল্পকালের পরিচয়েই তাঁহার প্রত্যেক কথাটি অসংশয়ে

বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, যদি পারো না, তবে সাপ ধরলে কী করে?

দিদি বললেন, ওটা শুধু হাতের কৌশল ইন্দ্র, কোনো মন্ত্রের জোরে নয়। সাপের মন্ত্র আমরা জানিনে।

ইন্দ্র বলিল, যদি জানো না, তবে তোমরা দুজনে জোচ্চুরি করে ঠকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন?

দিদি তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিলেন না; বোধ করি বা নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনরায় কর্কশকণ্ঠে কহিল, ঠগ জোচ্চোর সব — আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি তোমাদের মজা।

অদূরেই একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বলিতেছিল। আমি তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, দিদির মুখখানি একেবারে যেন মড়ার মতো সাদা হইয়া গেল। সভয়ে সসংকোচে বলিলেন, আমরা যে সাপুড়ে — ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা।

ব্যবসা বার করে দিচ্ছি — চল্‌রে শ্রীকান্ত, জোচ্চোর শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা। বলিয়া ইন্দ্র সহসা আমার হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ইন্দ্রকে দোষ দিতে পারি না, কারণ তাহার অনেক দিনের অনেক বড়ো আশা একেবারে চোখের পলকে ভূমিসাৎ হইয়া গেল, কিন্তু আমার দুই চোখ যে দিদির সেই দুটি চোখের পানে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। জোর করিয়া ইন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাঁচটি টাকা রাখিয়া দিয়া বলিলাম, তোমার জন্যে এনেছিলাম দিদি — এই নাও।

ইন্দ্র ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, আবার টাকা! জোচ্চুরি করে এরা আমার কাছ থেকে কত টাকা নিয়েচে, তা তুই জানিস শ্রীকান্ত? এরা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক, সেই আমি চাই।

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, না ইন্দ্র, দাও — আমি দিদির নাম করে এনেচি —

ওঃ ভারী দিদি! বলিয়া সে আমাকে টানিয়া বেড়ার কাছে আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে গোলমালে শাহ্‌জির নেশার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে কেয়া হুয়া! কেয়া হুয়া! বলিয়া উঠিয়া বসিল।

ইন্দ্র আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকু শালা। রাস্তায় তোমাকে দেখতে পেলে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব। কেয়া হুয়া! বদমাস ব্যাটা কিচ্ছু জানে না — আর বলে বেড়ায় মন্তরের জোরে মড়া বাঁচাই! কখনো পথে দেখা হলে এবার ভালো করে বাঁচাব তোমাকে! বলিয়া সে এমনি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল যে শাহ্‌জি চমকাইয়া উঠিল।

তাহার একে নেশার ঘোর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড! সেই যে সাধুভাষায় বলে, 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হইয়া বসিয়া থাকা, ঠিক সেইভাবে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দ্র আমাকে লইয়া যখন দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন সে বোধ করি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিষ্কার বাংলা করিয়া ডাকিল, শোন্ ইন্দ্রনাথ, কী হয়েচে বল্ তো? আমি তাহাকে এই প্রথম বাংলা বলিতে শুনিলাম।

ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কিছু জানো না — কেন মিছামিছি আমাকে ধোঁকা দিয়ে এত দিন এত টাকা নিয়েচ, তার জবাব দাও।

সে কহিল, জানিনে তোমাকে কে বললে?

ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ওই স্তব্ধ নতমুখী দিদির দিকে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, ওই বললে, তোমার কানাকড়ির বিদ্যে নেই। বিদ্যে আছে শুধু জোচ্চুরি করবার আর লোক ঠকাবার। এই তোমাদের ব্যবসা। মিথ্যাবাদী চোর।

শাহ্‌জির চোখ দুটো ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে যে কী ভীষণ প্রকৃতির লোক, সে-পরিচয় তখনও জানিতাম না। শুধু তাহার সেই চোখের দৃষ্টিতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। লোকটা তাহার এলোমেলো জটাটা বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, বলেচিস তুই?

দিদি তেমনি নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। ইন্দ্র আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, রাত্তির হচ্ছে — চল্ না। রাত্রি হইতেছে সত্য, কিন্তু আমার পা যে আর নড়ে না। কিন্তু ইন্দ্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, আমাকে প্রায় জোর করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শাহ্‌জির কণ্ঠস্বর আবার কানে আসিল — কেন বললি?

প্রশ্ন শুনিলাম বটে, কিন্তু প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইলাম না। আমরা আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই অকস্মাৎ চারিদিকের সেই নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটা

তীব্র আর্তস্বর পিছনের আঁধার কুটির হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কানে বিঁধিল এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই ইন্দ্র সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিল। সুমুখেই একটা শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড় ছিল; আমি সবেগে গিয়া তাহারই উপরে পড়িলাম। কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। সে যাক, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেই প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। এ কাঁটা ছাড়াই তো সে-কাঁটায় কাপড় বাধে; সে কাঁটা ছাড়াই তো আর একটা কাঁটায় কাপড় আটকায়। এমনি করিয়া অনেক কষ্টে, অনেক বিলম্বে যখন কোনো মতে শাহ্জির বাড়ির প্রাঙ্গাণের ধারে গিয়া পড়িলাম, তখন দেখি সেই প্রাঙ্গাণেরই একপ্রান্তে দিদি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং আর এক প্রান্তে গুরুশিষ্যের রীতিমতো মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা তীক্ষ্ণধার বর্শা পড়িয়া আছে।

শাহ্জি লোকটি অত্যন্ত বলবান। কিন্তু ইন্দ্র যে তাহার অপেক্ষাও কত বেশি শক্তিশালী, এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না। থাকিলে বোধহয় সে এত বড়ো দুঃসাহসের পরিচয় দিত না। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্র তাহাকে চিত করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। সে এমনি টিপুনি যে, আমি বাধা না দিলে হয়তো সে যাত্রা শাহ্জির সাপুড়ে যাত্রাটাই শেষ হইয়া যাইত।

বিস্তর টানা-হেঁচড়ার পর যখন উভয়কে পৃথক করিলাম, তখন ইন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। অন্ধকারে প্রথমে নজরে পড়ে নাই যে তাহার সমস্ত কাপড়-জামা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, শালা গাঁজাখোর আমাকে সাপ-মারা বর্শা দিয়ে খোঁচা মেরেছে — এই দ্যাখ। জামার আস্তিন তুলিয়া দেখাইল, বাহুতে প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত এবং তাহা দিয়া অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে।

ইন্দ্র কহিল, কাঁদিস নে — এই কাপড়টা দিয়ে খুব টেনে বেঁধে দে — এই খবরদার! ঠিক অমনি করে বসে থাকো। উঠলেই গলায় পা দিয়ে তোমার জিভ টেনে বার করব — হারামজাদা শুয়ার। নে, তুই টেনে বাঁধ — দেরি করিস নে। বলিয়া সে চড়চড় করিয়া তাহার কোঁচার খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। আমি কম্পিত হস্তে ক্ষতটা বাঁধিতে লাগিলাম এবং শাহ্জি অদূরে বসিয়া মুমূর্ষু বিষাক্ত সর্পের দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ইন্দ্র কহিল, না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি খুন করতে পারো। আমি তোমার হাত বাঁধব। বলিয়া তাহারই গেরুয়ারঙে ছোপানো পাগড়ি দিয়া টানিয়া টানিয়া দুই হাত

জড়ো করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সে বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না।

যে লাঠিটার আঘাতে দিদি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল সেটা তুলিয়া লইয়া একপাশে রাখিয়া ইন্দ্র কহিল, কী নেমকহারাম শয়তান এই ব্যাটা। বাবার কত টাকা যে চুরি করে একে দিয়েছি, আরও কত হয়ত দিতাম, যদি দিদি না আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করত। আর স্বচ্ছন্দে ও ওই বল্লমটা আমাকে ছুড়ে মেরে বসল। শ্রীকান্ত নজর রাখ্‌, যেন না ওঠে — আমি দিদির চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিই।

জলের ঝাপটা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, যেদিন থেকে দিদি বললে, 'ইন্দ্রনাথ, তোমার রোজগারের টাকা হলে নিতাম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের ইহকাল পরকাল মাটি করব না', সেই দিন থেকে ওই শয়তান ব্যাটা দিদিকে কত মার মেরেচে, তার হিসেব-নিকেশ নেই। তবু দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে খাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে — তবুও কিছুতে ওর হয় না। কিন্তু আমি ওকে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়ব — না হলে দিদিকে ও খুন করে ফেলবে, ও খুন করতে পারে।

আমার মনে হইল, লোকটা যেন এই কথায় শিহরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ মুখখানা নত করিয়া ফেলিল। সে একটি নিমেষমাত্র। কিন্তু অপরাধীর নিবিড় আশঙ্কা তাতে এমনি পরিস্ফুট হইতে দেখিয়াছিলাম যে, আমি আজিও তাহার তখনকার সেই চেহারাটা স্পষ্ট মনে করিতে পারি।

আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনি আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা তো করিবেই, পরন্তু উদ্ভট কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে হয়তো ইতস্তত করিবে না। তথাপি এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য। কারণ সত্যের উপরে না দাঁড়াইতে পারিলে কোনোমতেই এই সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না। প্রতি পদেই ভয় হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। জগতে বাস্তব ঘটনা যে কল্পনাকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া যায়, এ কৈফিয়ত নিজের কোনো জোরই দেয় না, বরঞ্চ হাতের কলমটাকে প্রতি হাতেই টানিয়া টানিয়া ধরিতে থাকে।

যাক সে কথা। দিদি যখন চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি বোধ করি দ্বিপ্রহর। তাঁহার বিহ্বল ভাবটা ঘুচাইতে আরও ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তারপরে আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া শাহ্‌জির বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন,

যাও, শোও গে।

লোকটা ঘরে চলিয়া গেলে তিনি ইন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া, তাহার ডান হাতটা নিজের মাথার উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, ইন্দ্র, এই আমার মাথায় হাত দিয়া শপথ কর ভাই, আর কখনো এ বাড়িতে আসিসনে। আমাদের যা হবার হোক, তুই আর আমাদের কোনো সংবাদ রাখিসনে।

ইন্দ্র প্রথমটা অবাক হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তা বটে! আমাকে খুন করতে গিয়েছিল, সেটা কিছু নয়। আর আমি যে ওকে বেঁধে রেখেছি, তাতেই তোমার এত রাগ! এমন না হলে কলিকাল বলেচে কেন? কিন্তু কী নেমকহারাম তোমরা দুজন! — আয় শ্রীকান্ত, আর না।

দিদি চুপ করিয়া রহিলেন — একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করিলেন না। কেন যে করিলেন না তাহা পরে যতই বেশিই বুঝিয়া থাকি না কেন তখন বুঝি নাই। তথাপি আমি অলক্ষে নিঃশব্দে সেই টাকা পাঁচটি খুঁটির কাছে রাখিয়া দিয়া ইন্দ্রের অনুসরণ করিলাম। ইন্দ্র প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, হিঁদুর মেয়ে হয়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার আবার ধর্মকর্ম! চুলোয় যাও — আর আমি খোঁজ করব না, খবরও নেব না — হারামজাদা নচ্ছার! বলিয়া দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

দুজনে নৌকায় আসিয়া বসিলে ইন্দ্র নিঃশব্দে বাহিতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে হাত তুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে যে কাঁদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া আর কোনো প্রশ্ন করিলাম না।

শ্মশানের সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই পথ দিয়াই এখনই চলিয়াছি, কিন্তু কেন জানি না, আজ আমার ভয়ের কথাও মনে আসিল না। বোধ করি, মন আমার এমনি বিহ্বল আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, এত রাত্রে কেমন করিয়া বাড়ি ঢুকিব এবং ঢুকিলেও যে কী দশা হইবে, সে-চিন্তাও মনে স্থান পাইল না।

প্রায় শেষ রাত্রে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। আমাকে নামাইয়া দিয়া ইন্দ্র কহিল, বাড়ি যা শ্রীকান্ত। তুই বড়ো অপয়া! তোকে সঙ্গে নিলেই একটা-না-একটা ফ্যাসাদ বাধে। আজ থেকে তোকে আর আমি কোনো কাজে ডাকব না — তুইও আর আমার সামনে আসিসনে। যা! বলিয়া সে গভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব্ধ হইয়া নির্জন নদীতীরে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম।

স্ত্রী জাতির অবনতি

বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন

আমাদের শয়ন কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুলকলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন — কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বারা কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোনো উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোক-দীপ্তি পাইতে না পাইতে চিরনিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা 'স্ত্রীশিক্ষা' শব্দ শুনিলেই 'শিক্ষার কুফলের' একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোনো কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারির ওই 'শিক্ষার' ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে 'স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার'।

আজি কালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকরি লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকরি গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, "ভরসা কেবল পতিতপাবন", কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে ("God helps those that helps themselves")। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ

আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোলো আনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধহয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্যে তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচির্ক বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি-পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ওই অকর্মণ্য পুরুষেরাই 'স্বামী' থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন তিনিও তো স্ত্রী উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না। ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে। এখন আরও আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোনো বস্তু নাই — এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কী করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কী করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত, সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যিক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নয়, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি-কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিস্টার, লেডি-জজ — সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডি (Viceroy) হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে 'রানি' করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামী'র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?....

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন?

কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।

যদি বলো, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে-দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহু-লতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি তো এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কিনা।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপে? কোনো ব্যক্তি এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে — একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতা-মাতা — উভয়েরই সমান দরকার। কী আধ্যাত্মিক জগতে, কী সাংসারিক জীবনের পথে — সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমত, উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন — আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন। তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে-সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচারী, সহকার্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, এ কথা নিশ্চিত।

সংস্কৃতি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানুষ বিশেষভাবে নিজকে জানবার প্রথম চেষ্টা করে প্রাচীন গ্রিস দেশে। সেখানে মানুষের জীবনের কেন্দ্র, চিন্তার কেন্দ্র ছিল নগরে — যেমনটা প্রায় সব দেশেই হয়ে থাকে। প্রাচীনকালের সুসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির মানুষের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই যেমন দেখা যায়, তেমনি প্রাচীন গ্রিসেও ছিল — তারা মনে করত যে, যেহেতু তারা ছিল হেল্লেনেস (Hellenes) বা গ্রিক, সেই হেতু তারাই জগতে মানুষের মধ্যে ছিল উন্নত, তারাই ছিল শ্রেষ্ঠ আর সভ্য আর বাকি সব জাতির মানুষ, যাদের ভাষা ছিল গ্রিকদের কাছে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য, তারা সকলে ছিল বার্বারোই (Barbaroi) বা বর্বর-অসভ্য। গত দুই-তিন হাজার বৎসরের বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে আর নৃতত্ত্ববিদ্যা নামে নবজাত মানব-বিষয়ক বিজ্ঞানের বলে, তা ছাড়া পশ্চাৎপদ জাতির মানুষকে দলনে সভ্য জাতির মানুষের ক্ষমতা বা অধিকার কার্যত মেনে নিয়ে — আজকাল আমরা যে-রকম ব্যাপকভাবে মানুষকে 'সভ্য' অথবা 'অসভ্য' পর্যায়ে ফেলি, সেটা প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল। ভারতবর্ষেও, যারা আর্য ভাষা-নিবন্ধ ধর্ম আর রীতি-নীতি গ্রহণ করেছিল, তারা ছিল 'আর্য', আর বাকি ছিল 'ম্লেচ্ছ' অর্থাৎ 'মিশ্র' জাতির মানুষ। এতদ্ভিন্ন, চতুর্বর্ণের theory বা ধারণা আসাতে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে একটু অন্যভাবে, ধর্মনৈতিক দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা ভারতবর্ষে হয়েছিল। সভ্য আর অসভ্য সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রিসে আর ভারতে এই ধরনের মনোভাব ছিল — নাগরিক-ই সভ্য, গ্রাম-ই অ-সভ্য। সংস্কৃতের 'সভ্য' শব্দের মুখ্য অর্থ — যা সভার উপযুক্ত, যেখানে পাঁচজনে ভদ্রভাবে বা বন্ধুভাবে মিলিত হয়ে, সেখানকার উপযুক্ত; আদিআর্য ভাষায় 'সভ্য' মানে কোনো গোত্র বা গোষ্ঠী দলের মানুষ, এই শব্দের ইন্দো-ইউরোপীয় প্রতিরূপ হচ্ছে *sebhyos যা-থেকে অধুনা প্রায় অপ্রচলিত ইংরেজি শব্দ sub, sibling (অর্থাৎ 'আত্মীয়') উদ্ভূত হয়েছে, আর জার্মান শব্দ sippe অর্থাৎ 'জাতিগোষ্ঠী'। তা হলে 'সভ্য' শব্দ মূলত হচ্ছে 'গোষ্ঠীসম্পৃক্ত'; তারপলে হল 'জনসমাগম-সম্পৃক্ত'; পরে 'ভদ্র, সংযত সংস্কারযুক্ত, refined, civi-

lized', এই-সব অর্থ সহজেই উদ্ভূত হয়।

ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে আমরা হালে civilized আর uncivilized শব্দ দুটি শিখলুম। নৃতত্ত্ববিদ্যা তখন শিশু অবস্থায়; অনেকটা ইউরোপীয় শ্বেতকায় শ্রেষ্ঠতা-বোধের দ্বারা চালিত সেই শিশু-বিদ্যার নির্দেশে আমরা তখন মানুষকে civilized বা uncivilized পর্যায়ে ফেলতে আরম্ভ করলুম। তখন আমাদের ভাষায় এই দুই ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দের দরকার হল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে আমরা 'সভ্য' আর তার বিপরীত 'অসভ্য' এই দুটি শব্দ সংস্কৃত থেকে গ্রহণ করলুম। এইবারে, একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দেখবার রীতি এল; সংস্কৃত 'সভ্য' আর 'অসভ্য' শব্দদ্বয় বাংলা আর আধুনিক ভারতীয় ভাষায় তাদের আধুনিক অর্থ গ্রহণ করলে।

মানুষের সভ্যতা বা সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ লাভের কথা আলোচনা করে আমাদের জ্ঞান আর বোধশক্তি যতই বাড়তে লাগল, ততই এ সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে দেখার আবশ্যকতা দেখা দিল, সেই সঙ্গো দেখা দিল নতুন শব্দের আবশ্যকতাও। পার্থিব বা ভৌতিক সভ্যতা তো বহু জাতির বা জনগণের মধ্যে আছেই; কিন্তু আমরা ক্রমে উপলব্ধি করতে পারলুম — ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, সুসংবদ্ধ জীবন-রীতি প্রভৃতির অতিরিক্ত আর একটা কিছু জাতির জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতরের ব্যাপাররূপে প্রতিভাত হয়। সেটা একদিকে তার বাইরের সভ্যতার আভ্যন্তর-প্রাণ বা অনুপ্রেরণা বটে, তবে একদিকে তার বাহ্য সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই অভ্যন্তর অথচ তার বাইরেও প্রকাশমান এই অতিরিক্ত বস্তুটির নামকরণ হয়েছে ইংরেজি প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় Culture (জার্মানে Kultur কুল্‌তুর') শব্দরূপে। বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল আর ফল, আবার ফল থেকে বীজ, তা থেকে পুনরায় গাছ; বিভিন্ন গাছের ভিতর দিয়ে এই কার্য বা গতিক্রম চলেছে। যদি এক-ই বিশাল আর ক্রমবর্ধিষ্ণু বনস্পতির ভিতরেই এই গতিক্রম কার্যকর হয়ে দেখা দিত, তাহলে কোনো সমাজের গতিশীল সভ্যতা আর সংস্কৃতির সঙ্গো উপমার বস্তু পাওয়া যেত। আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি, একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর-প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তাই হচ্ছে culture। অবশ্য একেবারে সর্বজন-স্বীকৃত পারিভাষিক শব্দরূপে civilization যা সভ্যতা আর culture শব্দ দুটিকে সকলেই এইভাবে সবসময়ে ব্যবহার করে না; কিন্তু যখন কোনো জাতের বাইরেকার সভ্যতা দেখে তাকে পুরোপুরি চেনা যায়, তখন বলতে হয় — 'এহো বাহ্য', ভিতরের কথার কী? তখন তার মানসিক আর আনুভবিক দৃষ্টিভঙ্গি

বা বিচার, তার উপলব্ধি, আর তার বাহ্য সাধন আর প্রকাশ, তার দর্শন সাহিত্য শিল্প সংগীত প্রভৃতি, তার মানসিক প্রবৃত্তি আর তার অবচেতনা, তার নৈতিক আদর্শ আর তৎপ্রকাশক সহজ ক্রিয়া আর কৃত্রিম পরিপাটি, এ-সমস্তের কথা এসে যায়; এ-সমস্তকে বাহ্য 'সভ্যতা' ছাড়া আর একটা সর্বন্ধর সংজ্ঞা দিতে ইচ্ছা হয়। সেই সংজ্ঞাটি ইউরোপে culture শব্দের রূপে দেখা দিয়েছে।

এই culture শব্দের মূলে আছে লাতিনের culture 'কুলতুরা' শব্দ; এই শব্দ লাতিনের col 'কোল্' ধাতু থেকে হয়েছে, col অর্থে 'কৃষ্, চাষ করা', আবার 'যত্ন করা, পূজা করা'-ও হয়। Culture-এর অনুরূপ প্রতিশব্দ 'উৎকর্ষসাধন' বেশ হতে পারে, খালি 'উৎকর্ষ' শব্দও চলতে পারে। 'টানা' ও পরে 'লাঙ্গল টানা' বা 'চাষ করা' অর্থে, 'কৃষ্' ধাতু থেকে জাত 'কৃষ্টি' শব্দটিকে অর্থের দিক থেকে culture-এর প্রতিরূপ শব্দ মনে করে, বাংলায় ব্যবহার করা হতে থাকে বোধ হয় গত তিরিশ বছরের ভিতরে। বঙ্কিমচন্দ্র culture-অর্থে 'অনুশীলন' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও 'কৃষ্টি' শব্দটি গতানুগতিকভাবে গ্রহণ করে থাকবেন — যদি তিনি স্বয়ং এই শব্দটি বাংলায় চালিয়ে না থাকেন। 'কৃষ্টি'-র অন্তর্গত পরিবর্তন বৈদিক আর সংস্কৃত সাহিত্যে যা দেখা যায়, তা থেকে কিন্তু বাংলায় গৃহীত এর culture-অর্থ সমর্থিত হয় না। 'কৃষ্টি'-র মূলতগত অর্থ 'কর্ষণ-কার্য', তা থেকে 'চাষ-করা খেত', তা থেকে 'ক্ষেত্র', 'ভূমি', 'দেশ' এবংতারপরে 'দেশের মানুষ', 'জাতি'। বৈদিক ভাষায় 'কৃষ্টি' মানে 'জাতি'; যেমন, 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ' মানে 'পাঁচ জাতি' — প্রথম প্রথম আর্যজাতির পাঁচটি প্রধান শাখা — অনু, দ্রুহ্যু, তুর্বশ, যদু আর পুরু বংশের লোকেদের সম্বন্ধে এই 'পঞ্চকৃষ্টয়ঃ', শব্দ প্রযুক্ত হত, পরে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝাবার জন্য এই শব্দের অর্থ প্রসার ঘটে। 'চাষ'-অর্থেই 'কৃষ্টি' শব্দ পরবর্তী সংস্কৃতে মেলে। Culture-অর্থে নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' সম্বন্ধে একটু অস্বস্তিতে ছিলেন।

'সংস্কৃতি' শব্দ culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে পেয়ে, রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশি হন। এই শব্দটি বাংলায় এখন থেকে ২৪-২৫ বছর আগে কেউ ব্যবহার করেছেন কি না জানি না। 'সংস্কার' শব্দটি অবশ্য পাওয়া যায়, তা কিন্তু culture-অর্থে নয়; কতকগুলি সামাজিক ধার্মিক অনুষ্ঠান (যেমন, বিবাহ-সংস্কার), আর চিরপোষিত বা বংশধারানুসারে লব্ধ বোধ বা বিচার অর্থে শব্দটি রূঢ়ি হয়ে গিয়েছে। 'সংস্কৃত' শব্দটি, মূলত শব্দ বা উন্নত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, উপরন্তু সংস্কৃত ভাষা অর্থেও সুপ্রচলিত। 'সংস্কৃতি'

শব্দটি culture বা civilization অর্থে আমি পাই প্রথমে ১৯২২ সালে প্যারিসে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে। Culture-এর বেশ ভালো প্রতিশব্দ বলে শব্দটি আমার মনে লাগে। আমার বন্ধুটি শব্দটি পেয়ে আমার আনন্দ দেখে একটু বিস্মিত হন — তিনি বললেন যে, তাঁরা তো বহুকাল ধরে মারাঠি ভাষায় এই শব্দ ব্যবহার করে আসছেন।

১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করি। 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি আগে থাকতেই এই শব্দটি পেয়েছিলেন কি না, জানি না — সম্ভবত শব্দটি তাঁর অবিদিত ছিল না। তবে আমার বেশ মনে আছে culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দ সম্বন্ধে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেন, 'কৃষ্টি' শব্দ আর ব্যবহার করা ঠিক হয় না, একথাও বলেন। 'সংস্কৃতি' শব্দ ঋগ্‌বেদে নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-গ্রন্থে আছে; আর এ বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃত একটি অতিসুন্দর উক্তির প্রতি শান্তিনিকেতনের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে থেকেই এটি দেখে থাকবেন। শিল্পস্তুতি সম্বন্ধে উক্তিটি,

"ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেযাং বৈ
দেবশিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে — হস্তী,
কংসো, বাসো, হিরণ্যম্, অশ্বতরীরথঃ শিল্পম্।....
আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি, ছন্দোময়ং বা এতৈর্য -
জমান আত্মানং সংস্কুরুতে।"

"(পার্থিব) শিল্পসমূহ দেব-শিল্প বা স্বর্গীয়-সমূহকেই প্রশংসা করে; এই সমস্তের (অর্থাৎ দেব-শিল্পের) অনুকৃতিরূপেই এই পৃথিবীতে শিল্পকে ধরা হয়। শিল্প-দ্রব্য কীরকম? হস্তী অর্থাৎ হাতির দাঁতের কাজ, কাংস্য বা ধাতব পাত্র, বিবিধ প্রকারের বস্ত্র, স্বর্ণ-নির্মিত অলংকারাদি, অশ্বতরী-যুক্ত রথ — এই প্রকার। এই শিল্পসমূহ হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি; এগুলির দ্বারা যজমান (সাধারণ গৃহস্থ) নিজেকে ছন্দোময় করে।"

এখানে চমৎকারভাবে আত্মোন্নতি-বিধানে, আত্মিক সংস্কৃতিতে, নিজের জীবনকে ছন্দোময় করতে শিল্পের কাজ কী, তা বলা হয়েছে। রূপ-শিল্প, রূপ-কর্মও যে সংস্কৃতির সাধন, তার বিচারও এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

Civilization বা সভ্যতা হচ্ছে (বিশেষ করে তার বহিরঙ্গ বা পার্থিব দিকে)

মুখ্যত জনসমাজের ব্যাপার — নগরের ব্যাপার। মানুষে মানুষে মেলামেশা না-হলে, বুদ্ধির বিচারের আর উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হয় না। অবশ্য গভীর অনুভূতি বা উপলব্ধির জন্য মানুষকে কৃত্রিম নাগরিক আবেষ্টনী ছেড়ে কোথাও বা প্রাকৃতিক গ্রাম্য বা আরণ্য বা পার্বত্য আবেষ্টনীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ভারতবর্ষের গভীরতম উপলব্ধি ঘটেছিল তপোবনে, নগর থেকে দূরে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের অবস্থিত আশ্রমে। কিন্তু ভারতের সভ্যতার পার্থিব উৎকর্ষের ক্ষেত্র নগর-ই ছিল। শহরের বস্তু বলেই উদ্ভাবনী সভ্যতাকে যে-নামে ইউরোপে অভিহিত করা হয়, তার মূলে আছে লাতিন ভাষার ‘civis’ শব্দ, যার অর্থ ‘নগর’। লাতিন ‘urbs’ শব্দের মানেও ‘নগর’; তা থেকে ‘urban’ শব্দ, অর্থ ‘নাগরিক, উন্নত, ভদ্র, সংস্কৃতিযুক্ত’। আরবদের মধ্যেও শহরের সঙ্গে সভ্যতার অচ্ছেদ্য বন্ধন স্বীকার করা হয়, তাই, যা ‘মদীনা’ অর্থাৎ নগরের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই-ই হচ্ছে ‘তমদ্দুন’ বা সভ্যতা। ‘নাগরিকতা’ শব্দ সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়; শব্দটি বেশ উপযোগী ছিল, কিন্তু ‘নগর’ শব্দ থাকতে বাংলায় ‘নাগরিকতা’-র একটু অর্থাবনতি ঘটেছে। ‘সভা’-র সঙ্গেই যা জড়িত, ‘সভা’ থেকেই অর্থাৎ মানবগণের সংগমন বা ‘অন্‌জুমন’ থেকে, একত্রীভবন থেকে, যা উঠেছে তাকেই আমরা ‘সভ্যতা’ বলি।

যুগে যুগে elemental অর্থাৎ ঔপাদানিক বা মৌলিক ভাবকে প্রকাশ করতে যে বিভিন্ন শব্দ লোকপ্রিয় হয়ে থাকে, নতুন আর সূক্ষ্ম নানাভাবের জন্য যেভাবে শব্দ ভাষায় প্রযুক্ত হয়ে থাকে, সে-সম্বন্ধে, আর civilization ও culture -এর বাংলা প্রতিশব্দ সম্বন্ধে, এতক্ষণ আমি কতকটা অসংলগ্নভাবে একটু প্রসঙ্গ করলুম। আজকাল হাটে-বাটে সর্বত্র যে-শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, সেই ‘সংস্কৃতি’ শব্দ সম্বন্ধে, তার অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধেও দুটো কথা বললুম। এইবারে বিশেষ করে ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অল্প কিছু নিবেদন করে আমার আলোচনার উপসংহার করব।

ভারতের বাহ্য বা পার্থিব সভ্যতা একটা বিরাট ব্যাপার। ভারতের এই civilization যে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন ও মধ্যযুগের civilization-এর চেয়ে কম নয়, সেকথা সর্ববাদিসম্মত। প্রকৃতিতে এই পার্থির সভ্যতা অন্য পাঁচটি দেশের পার্থিব সভ্যতার সমপর্যায়েরই বস্তু। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভারতের বাস্তু, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা ও নানা হস্তশিল্প, ভারতের দর্শন আর ধর্ম, ভারতের সাহিত্য — এসব তো আছে। কিন্তু এর প্রাণ কোথায়? ভারত-সভ্যতা তরুর সংস্কৃতি-পুষ্প কীভাবে ফুটে উঠেছে? সেটা একটু

প্রণিধান করে দেখবার বিষয়।

ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, ভারতের সত্যকার সংস্কৃতি, আমার মনে হয়, কতকগুলি ভাবপুঞ্জ নিয়ে, যেগুলি একাধারে ভারতের বাহ্য সভ্যতার অনুপ্রেরণারূপে আর তার প্রকাশরূপেও বিদ্যমান। এই ভাবপুঞ্জ ভারতের জনগণের ইতিহাসের আধারেই দানা বেঁধেছে। নানা জাতির সম্মিলন ও সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জাতি গড়ে উঠেছে — এইসব জাতির ভাষা আর সভ্যতা, এদের সংস্কৃতি, এদের ঐতিহ্য, মূলত পৃথক ছিল। কিন্তু অস্ট্রিক-ভাষী, দ্রাবিড়-ভাষী আর ভোটচিন-ভাষী বিভিন্ন সংস্কৃতির জনগণ আর্য ভাষা গ্রহণ করে আর্য-ভাষীদের প্রথমটায় বিজেতা হয়ে আসে; বিজেতার দর্প আর দম্ভ-জাত আর্য-ভাষীদের মধ্যে বহুদিন ধরে ছিল, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু শেষটায় যখন এইসব জাতির মিশ্রণ ঘটল, তখন, এদের নিজ-নিজ পৃথক জাতিত্ব আর সত্তা সম্বন্ধে যে বোধ ছিল, আর এই বোধ নিয়ে যে স্বাভাবিক গর্ব ছিল, সেটা লোপ পেলে — সকলেই এক নব-সৃষ্ট জাতিতে বিলীন হয়ে গেল, এক বিরাট সমন্বয়ে সকলেই যেন নিজ সার্থকতা লাভ করলে। পৃথক স্বজাতি-গর্ব আঁকড়ে ধরে থাকলে, মিলিতভাবে একটি নতুন মিশ্র জাতির সৃজন হতে পারত না। বিভিন্ন জাতির দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মবিচার বা সিদ্ধান্ত, আচার-অনুষ্ঠান — এসব এককে অপরের সামনে তুচ্ছ করে দেখবার ও দেখাবার প্রবৃত্তি আর থাকা সম্ভবপর হল না, কারণ এসব জিনিস এই মিশ্র জাতির জনগণের পিতৃকুলাগত বা মাতৃকুলাগত রিক্থ হয়ে দাঁড়াল। এই জন্য হিন্দু সভ্যতার প্রথম থেকেই একটি বড়ো সাংস্কৃতিক সূত্র প্রকট হল — সমন্বয়। বিভিন্ন ধর্ম-মত বা বিচার এক-ই সত্যে পৌঁছোবার বিভিন্ন পথ মাত্র — এই বোধ ভারতীয় জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হল। এই পরমত-সহিষ্ণুতা ভারতের সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো কথা। ভারতীয় ঔদার্য দেখিয়ে কেবল বলবে না, সব ধর্মেই বা সব সমাজেই সত্য আছে, — তবে আমার ধর্মে আর আমার সমাজেই সত্যটা পুরোপুরি বিদ্যমান; ভারতীয় বলবে, বিভিন্ন ধার্মিক অবলোকন বা দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শন, দেশকাল পাত্রভেদে অবশ্যম্ভাবী রূপেই দেখা দিয়েছে, আর এইসব দর্শন, যতক্ষণ-না অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, ততক্ষণ নিজ সার্থক মহিমায় সকলের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। বিভিন্ন আপাতবিরোধী মতবাদের মধ্যেকার ঐক্য বার করে, একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা, চিরকাল ধরে ভারতীয়রা করে এসেছে; পিতৃলোক আর পুনর্জন্ম, হোম আর পূজা, এক আর বহু দুই-ই একসঙ্গে দেখা, পিণ্ডদানে মুক্তি আর অনপনেয় কর্মফল, জ্ঞান আর ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম আর সকাম অনুষ্ঠান, সামাজিক বিভেদ

আর সামাজিক সমীকরণ — এ সমস্তকেই ধরে নিয়ে। এদের বিবাদের মধ্যে সংবাদ আবিষ্কার করে, এক মহান মিলন-সংগীত গাইবার চেষ্টা ভারতীয় সংস্কৃতি প্রথম কথা।

তারপরে, ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বিতীয় বড়ো কথা হচ্ছে এর তত্ত্বানুসন্ধিৎসা। বিচারের পথে বা অনুভূতির পথে, দৃশ্যমান জীবনের অন্তরালে অবস্থিত শাশ্বত সত্য বা সত্তার অনুসন্ধান ও জীবনে তার উপলব্ধি — এই-ই হচ্ছে মানুষের প্রধান কার্য। যদি বিচারের পথে গিয়ে কেউ নাস্তিক ভাবে পৌঁছোয়, তাতে দুঃখ নেই — নাস্তিকের সিদ্ধান্তকেও উড়িয়ে দেবার অধিকার নেই আমাদের, তাকেও জোর করে আস্তিক্যে আনবার চেষ্টা অবৈধ। প্রাচীন ভারতের আর্য আর বিভিন্ন প্রকারের অনার্য, বিশেষত দ্রাবিড় আর অস্ট্রিক-ভাষী অনার্য — এদের শ্রেষ্ঠ আদর্শসমূহের সমবায়ের ফল হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি। ব্রাহ্মণ্য দ্বারা যে প্রার্থনাটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনারূপে গৃহীত হয়েছে, সেটি হচ্ছে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রার্থনা; আর এই প্রার্থনায় আমরা দুটি অংশ পাই — একটিতে হচ্ছে জগৎ-প্রপঞ্চের স্রষ্টার অনুধ্যান ("তৎসবিতুর্বরেণ্যৎ ভর্গো দেবস্য ধীমহি" — সৃষ্টিকর্তার সেই বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি), আর অন্যটিতে এই প্রার্থনা যে, আমাদের জীবনে বুদ্ধিবৃত্তি যেন ভগবানের দ্বারায় পরিচালিত হয়, আমরা যেন বিধি-দত্ত বুদ্ধি ধরেই সব কাজ করে যেতে পারি ("ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" — তিনি আমাদের ধীসমূহকে পরিচালিত করুন)। এই জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা বা আকর্ষণ থাকাতে, বহু মুর্খতা, বহু গোঁড়ামি, বহু অন্ধবিশ্বাস নানাভাবে ভারতীয় জাতিকে নানা সময়ে বিপন্ন করে তুললেও, মোটের উপর সেসব কাটিয়ে উঠবার শক্তি এই জাতি তার সংস্কৃতির দ্বিতীয় মূলকথা এই তত্ত্বানুসন্ধিৎসা থেকে পেয়েছে।

'অহিংসা' হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির তৃতীয় কথা। এ অহিংসা কেবল প্রাণী হত্যা থেকে বিরত আর ছারপোকাকে মানুষের রক্ত খাওয়ানো নয় — এর পিছনে আছে 'করুণা' অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে দার্শনিকের চোখে দেখা দরদ, আর আছে 'মৈত্রী' অর্থাৎ সকলকে মিত্রভাবে দেখে তাদের মঙ্গল করার চেষ্টা। এই অহিংসা কেবল vegetable world বা উদ্ভিদজগতের উপযোগী নিষ্ক্রিয় অথবা পর-পরিচালিত ব্যাপার নয়। এর পিছনে আছে ন্যায়-দৃষ্টি ও সহানুভূতি; আর ন্যায়-দৃষ্টি আছে বলেই হিংসার পথে মূর্তি গ্রহণ করতেও ক্ষেত্র-বিশেষে বাধা নেই।

ভারতীয় সংস্কৃতির আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে 'দম' বা 'আত্মদমন'; 'ত্যাগ' বা শাশ্বত সত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে নশ্বর বস্তু-জগতের প্রতি উপেক্ষা; 'অপ্রমাদ' অর্থাৎ

নিজের বুদ্ধিকে প্রমত্ত বা ঘোলাটে না করা; জীবনের সব ক্ষেত্রে সত্য, শিব আর সুন্দরের আবাহন — ইত্যাদি অনেক বিষয়ে এই সংস্কৃতির প্রকাশ হয়েছে।

সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত — সেইজন্য এর চরম রূপ কোনো একসময়ে চিরকালের জন্য বলে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যাপার। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে নতুন নতুন ভাবপরম্পরা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছে, সমর্থও হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা আর সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট রূপ পাবার পরে, এদেশে ইসলামি সংস্কৃতির আবির্ভাব হল। এই সংস্কৃতির মধ্যে যা সনাতন আর বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য, সেটা হচ্ছে এর অন্তর্গত সুফি দৃষ্টিকোণ, সুফি আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই জিনিসকে মধ্যযুগের ভারত সাদরে বরণ করে নিলে, এর মধ্যে সে অচেনাকে খুঁজে পেলে। কবির, নানক, দাদু প্রভৃতি সন্তগণের আবির্ভাব হল, ভারতের সুফি সাধকেরা এলেন; কাশ্মীরের জৈনুল-আবেদিনের মতন উদার-হৃদয় রাজার, সম্রাট আকবরের মতন 'সুলহ্-ই-কুল্ল' অর্থাৎ বিশ্বমৈত্রীর প্রচারকের, রাজকুমার দারা শিকোহের মতন হিন্দু আর মুসলমান চিন্তার ও সাধনার দুই মহাসাগরের মিলানাকাঙ্ক্ষী স্বপ্নদ্রষ্টার প্রকাশ ঘটল। ইসলামি সংস্কৃতি আর ভারতীয় সংস্কৃতি, এই দুইয়ের পরস্পরের সঙ্গে সংস্পর্শ কেবল বিরোধের সংঘাত নয়। উগ্র পরমত-অসহিষ্ণুতার কাছে নম্র পরমত - সহিষ্ণুতাকে আপাতদৃষ্টিতে লাঘব স্বীকার করতে হয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু ঝড়ের পরে মৃদু সমীকরণের মতো সুফি মতবাদের আর ভারতীয় ভক্তিবাদের সমীকরণ-ই হচ্ছে ভারতে ইসলামি আর হিন্দু-সংস্কৃতির সংযোগ বা সংস্পর্শের মুখ্য কথা। নবীন যুগের এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতি — যা বিশুদ্ধ হিন্দুও নয়, বিশুদ্ধ আরব-জাত ইসলামও নয়, যা হচ্ছে সত্যকার ভারতীয় হিন্দু-ইসলামীয় সংস্কৃতি — এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে এখন আবার আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির মূল সূক্ষ্ম নানা ভাবধারা এসে মিশেছে — নানা ধরনের খ্রিস্টান মত ও সাধনা, জনসেবা, নানা নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আর সাহিত্যিক প্রকাশ, নানা নব নব শিল্প-সৃষ্টি, Socialism বা সম্পত্তি-সাম্য প্রভৃতি নানা সমাজসংস্কারের পরিকল্পনা আর প্রযোজনা। আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্ব-সংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে বহুরূপ হয়ে যা বিরাজ করবে, আর পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতি বা মানবসমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত করে এক করে তুলবে।

যুগজিজ্ঞাসা

অন্নদাশঙ্কর রায়

খুকুকে জিজ্ঞাসা করা হল, "খুকু, তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো? মাকে, না বাবাকে?"

খুকু কী উত্তর দিল জানেন? "মাকেও, বাবাকেও।"

তেমনই আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "কাকে বেশি ভলোবাসো? দেশকে না যুগকে?" আমি উত্তর দেব, "যুগকে, দেশকেও।"

দেশ এতদিন পরাধীন ছিল বলে আমরা দিনরাত দেশের কথাই ভেবেছি, যুগের প্রতি মনোযোগ দিইনি, যখনই কেউ মনে করিয়ে দিয়েছে তখনই আধুনিককে পাশ্চাত্য বলে এক খোঁচায় নস্যাৎ করে দিয়েছি। এখন তো দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন যুগের সঙ্গে মোকাবিলা করা দরকার। ওই কাজটা বকেয়া পড়ে রয়েছে।

গত শতাব্দীর নায়কদের মধ্যে যুগজিজ্ঞাসা প্রবল ছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউ দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে যুগকে অনাদর করেননি। কিন্তু ওই শতাব্দীরই শেষ ভাগে উলটো হাওয়া বইতে আরম্ভ করে। দেশানুরাগ হয়ে দাঁড়াল দেশের অতীতানুরাগ, যে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক বিশ্ব এর একটাকে বরণ করতে গেলে অপরটাকে উপেক্ষা করতে হবেই, মাঝখানে সেতুবন্ধনের আশা দুরাশা। অথচ এমনই আমাদের পরাধীনতার জ্বালা যে-আমরা ইংরেজ মনে করে ইউরোপকে বর্জন করব; ইউরোপ মনে করে আধুনিক যুগটাকে অগ্রাহ্য করব, থাকব কাকে নিয়ে? না, ভারতের অতীতকে।

ভূতকে নিয়ে ঘর করা যায় না। তার থেকে এল সেতুবন্ধনের কথা। প্রাচীন ভারতও থাকুক, আধুনিক বিশ্বও থাকুক, মাঝখানে একটা সেতু নির্মাণ করা হোক। সমন্বয়। তার মানে গোঁজামিল। অতীত সম্বন্ধে কারই বা সম্যক ধারণা আছে যে, দৃঢ় ভূমির উপর পা রেখে বলতে পারবে এই হল সেতুর এক প্রান্ত! প্রাচীন ভারতে

যেমন দেবতা ছিল তেমনই দানব ছিল, যেমন মানুষ ছিল তেমনই রাক্ষস ছিল, যেমন পাণ্ডব ছিল তেমনই কৌরব ছিল, যেমন অহিংসা ছিল তেমনই অতি ভয়ংকর ভয়ংকর মারণাস্ত্র ছিল, যেমন আস্তিক দর্শন ছিল তেমনই নাস্তিক দর্শন ছিল। প্রাচীন ভারতের স্বরূপ অনেকটা আধুনিক ইউরোপের মতো। সেখানে বহু বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি ক্রিয়া করছে। তাকে এককথায় আধিভৌতিক বলে পাতালে নামিয়ে দেওয়া যায় না, প্রাচীন ভারতকেও এককথায় আধ্যাত্মিক বলে আকাশে তুলে দেওয়া যায় না। আকাশের সঙ্গে পাতালকে একসূত্রে গাঁথা যায় না।

এই পণ্ডশ্রমের পশ্চাতে ছিল পরাধীনতাবোধ। এখন তো সে বোধ নেই। এখন পণ্ডিতদের বলা উচিত, আর পণ্ডশ্রম করতে হবে না, পুরোপুরি আধুনিক যুগের সঙ্গে অভিন্ন হও। অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা অপরের মধ্যে যতটা দেখছ তোমাদের মধ্যেও ততটা থাকবে। প্রাচীন ভারত তার আয়ু নিঃশেষে ভোগ করেছে, তোমাদেরটাও যেন গ্রাস না করে।

আর এই যে আধুনিক যুগ, ইউরোপ বা আমেরিকা এর একমাত্র শরিক নয়। তোমরাও শরিকান। তোমরা এক হাতে নেবে, আর এক হাতে দেবে, তোমাদেরও একটা ভূমিকা আছে, তোমরা তাতে অভিনয় করবে, কিন্তু খবরদার, সেটা হ্যামলেটের ভূতের পার্ট নয়। তোমরা প্রাচীন ভারতের ভূত নও। তোমরা আধুনিক ভারতের জীবন্ত মানুষ। তোমাদের ভূমিকা পূর্ব-নির্দিষ্ট নয়, তা সৃষ্টিশীল, তা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে চলবে। থাকবে তার মধ্যে তোমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, কেউ সাধছে না তোমাদের মার্কিন বা রুশ হতে। কিন্তু আধুনিক যুগের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলিও থাকা চাই।

এ যুগ যে বিজ্ঞানের যুগ এ কথা সকলে জানে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, মানবিকতার যুগ। যাকে বলে হিউম্যানিজম, তার লক্ষণ হল সমাজের চেয়ে মানুষ বড়ো, সম্প্রদায়ের চেয়ে মানুষ বড়ো, শ্রেণির চেয়ে মানুষ বড়ো, সংঘের চেয়ে মানুষ বড়ো। আগেকার দিনের মানুষের চেয়ে মানুষের সমাজ ইত্যাদিকে বড়ো করে দেখা হয়েছে। নারীকে, শূদ্রকে, ক্রীতদাসকে নির্মমভাবে ছোটো করে রাখা হয়েছে, যেন সেটা তাদের দৈবলিখন। দৈবলিখন বলে চালানো হয়েছে যা প্রতিকারযোগ্য, যা প্রতিকার করা সম্ভব, তাকে। সনাতন বলে চালানো হয়েছে যা তৎকালীন তাকে। প্রাকৃতিক বলে চালানো হয়েছে যা কৃত্রিম তাকে। নৈতিক বলে

চালানো হয়েছে যা বদ্ধমূল সংস্কার তাকে। সত্য বলে চালানো হয়েছে যা স্বার্থদুষ্ট তাকে।

বিদ্রোহ শুরু হয় ইউরোপের রেনেসাঁসের সময় থেকে। তা বলে বিদ্রোহটা শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। ওটা সর্বমানবের। যেমন ভারতীয়দের অহিংসা সত্যাগ্রহ সর্বমানবের। বিদ্রোহের ঢেউ এক বন্দর থেকে আর-এক বন্দরে পৌঁছোলেও সেটা বন্দরের ঢেউ নয়, সমুদ্রের ঢেউ। বিদ্রোহের হাওয়া এক দেশ থেকে আর-এক দেশে পৌঁছোলেও সেটা মাটির হাওয়া নয়, আকাশের হাওয়া। বিদ্রোহ ক্রমে ক্রমে আধুনিকতম রূপ নিয়েছে। কেউ পড়ে থাকতে চায় না, জাতের দরুন না, রঙের দরুন না, লিঙ্গের দরুন না। অনেক যুগের জমে থাকা পাপ এই যুগেই সাফ করতে হবে। তা সে যুদ্ধ করেই হোক বা বিপ্লব করেই হোক বা আপসেই হোক বা বন্ধুভাবেই হোক। শ্রেষ্ঠ উপায় অবশ্য বন্ধুভাব বা অহিংসা। নিকৃষ্ট উপায় যুদ্ধ। একটা উপায় ব্যর্থ হলে মানুষ আর -একটা উপায় পরীক্ষা করবেই। উদ্দেশ্য হল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা।

অবশ্য কেবল এই নিয়ে আয়ু শেষ করা সকলের কর্তব্য নয়। সৃষ্টির কাজ করে যেতে হবে আমাদের অনেককে। গায়ক গাইবে, বাদক বাজাবে, নর্তক নাচবে, ছবিকার ছবি আঁকবে, কবি কবিতা লিখবে। এসব কাজ একদিনও ফেলে রাখা যায় না। ফেলে রাখলে পরম্পরা কেটে যাবে। সাধনার ধারা শুকিয়ে যাবে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতো এসব প্রক্রিয়া নিত্য বহমান। কেউ যদি বলে, এসব কিছুকালের জন্যে বন্ধ রাখলে ক্ষতি কী, তাহলে বুঝতে হবে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মূল্য সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই। মানুষের দুর্ভাগ্য বর্তমান শতাব্দীতে এ ধরনের লোক সব দেশেই দলপতি হয়ে বসেছে। কোথাও কম, কোথাও বেশি।

বন্ধ রাখলে সাধারণের দিক থেকেই আপত্তি ওঠে। তখন এরা বলে এদের ফরমাস মতো লিখতে, আঁকতে, গাইতে, বাজাতে, নাচতে। আর-এক আপদ। এর চেয়ে বন্ধ করা কম খারাপ। শিল্পীদের পক্ষে আধুনিক যুগে বেঁচে থাকা শক্ত। বাঁচা অবশ্য কায়িক অর্থে নয়। সৃষ্টি করতে করতে বাঁচা। এর একটা নিষ্পত্তি চাই, নইলে আর সব হবে, রস হবে না, রূপ হবে না, সৌন্দর্য হবে না। এ যুগ যখন অতীত হয়ে যাবে তখন এর কোনো শিল্পসম্পদ রেখে যাবে না। পরবর্তী যুগের ওরা বলবে এ যুগ নিষ্ফলা, বন্ধ্যা।

সুতরাং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যা করতে চাও, করো। কিন্তু সেই সঙ্গো মনে রেখো শিল্পীদের বেঁচে থাকা দরকার। শুধু কায়িক অর্থে নয়, আত্মিক অর্থে। তারা যদি মনের মতো করে লিখতে না পারল, আঁকতে না পারল, গাইতে না পারল, নাচতে না পারল তাহলে তেমন বাঁচার কী তাৎপর্য! তারা যদি তোমাদের ফরমাশই খাটবে তাহলে তারা শিল্পী হতে যাবে কোন্ দুঃখে! তারা যুগের ভিতর দিয়ে কাজ করছে বটে, কিন্তু তারা নিত্যকালের রাখাল। অমৃতের সন্তান। যুগ যদি তাদের বিকৃতি ঘটায়, সেটা যুগেরই মুখবিকৃতি। ভাবীকাল তা দেখে হাসবে।

এ যুগের ভিতর দিয়ে যেতে হবে সকলকেই। শিল্পীকেও। কিন্তু শিল্পীর পরমায়ু যুগের চেয়েও দীর্ঘ। সেইজন্যে তার সাধনাও যুগকে অতিক্রম করবার মতো দুরূহ। এই দুরূহ নিয়ে যারা আছে তাদের সহজ দিয়ে ভোলানো যায় না। যারা নগদ বিদায় চায় তাদের ধারা আলাদা। তারা আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু যারা আজ আছে, কাল আছে, চিরকাল আছে, তাদের কাজে হস্তক্ষেপ না করে চুপ করে দেখো তারা কী লিখছে, কী আঁকছে, কী দিচ্ছে। তারা যদি বাঁচে তাদের মধ্যে, তাদের সৃষ্টির মধ্যে, তোমরাও বাঁচবে।

শিল্পীর দুর্দিন সব দেশেই লক্ষ করছি। সেইজন্যে যুগকেই তার জন্যে দায়ী করি। এ যুগ যদি শিল্পীদের সহ্য না হয় তাহলে আপশোশের সীমা থাকবে না, কারণ এমন বিষয়বস্তু, এত ঘাতপ্রতিঘাত, এতরকম চরিত্র, এ পরিমাণ সংস্কারমুক্তি আর কোনো যুগে সম্ভব হয়নি।

তিতাস

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

তিতাস একটি নদীর নাম। তার কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস।

স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।

ভেরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।

মেঘনা-পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নাই। আবার রমু মোড়লের মরাই, যদু পণ্ডিতের পাঠশালার পাশ দিয়া বহিয়া যাওয়া শীর্ণ পল্লিতটিনীর চোরা কাঙালপনাও তার নাই। তিতাস মাঝারি নদী। দুষ্ট পল্লিবালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার ছোটো নৌকায় ছোটো বউ নিয়া মাঝি কোনোদিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না।

তিতাস শাহি মেজাজে চলে। তার সাপের মতো বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্‌বেল করে না।

কত নদীর তীরে একদা নীল-ব্যাপারীদের কুঠি-কেল্লা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কত নদীর তীরে মোগল-পাঠানের তাঁবু পড়িয়াছে, মগদের ছিপনৌকা রক্ত-লড়াইয়ে মাতিয়াছে — উহাদের তীরে তীরে কত যুদ্ধ হইয়াছে। মানুষের রক্তে, হাতি-ঘোড়ার রক্তে সেসব নদীর জল কত লাল হইয়াছে। আজ হয়তো তারা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু পুথির পাতায় রেখ কাটিয়া রাখিয়াছে। তিতাসের বুকে তেমন কোনো ইতিহাস নাই। সে শুধু একটি নদী।

তার তীরে বড়ো বড়ো নগরী বসানো নাই। সওদাগরের নৌকারা পাল তুলিয়া তার বুকে বিচরণ করিতে আসে না। ভূগোলের পাতায় তার নাম নাই।

ঝরনা থেকে জল টানিয়া, পাহাড়ি ফুলেদের ছুঁইয়া ছুঁইয়া উপল ভাঙিয়া নামিয়া আসার আনন্দ কোনোকালে সে পায় নাই। অসীম সাগরের বিরাট চুম্বনে আত্মবিলয়ের আনন্দও কোনোকালে তার ঘটিবে না। দূরন্ত মেঘনা নাচিতে নাচিতে কোন্‌কালে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে পা ফসকাইয়াছিল; বাঁ-তীরটা একটু মচকাইয়া গিয়া ভঙিয়া যায়। স্রোত আর ঢেউ সেখানে প্রবাহের সৃষ্টি করে। ধারা সেখানে নরম মাটি খুঁজিয়া, কাটিয়া, ভাঙিয়া, দুমড়াইয়া পথ সৃষ্টি করিতে থাকে। এক পাকে শত শত পল্লি দুই পাশে রাখিয়া অনেক জঙ্গল অনেক মাঠে-ময়দানের ছোঁয়া লইয়া ঘুরিয়া আসে — মেঘনার গৌরব আবার মেঘনার কোলেই বিলীন হইয়া যায়। এই তার ইতিহাস। কিন্তু সে কি আজকের কথা? কেউ মনেও করে না কীসে তার উৎপত্তি হইল। শুধু জানে সে একটি নদী। অনেক দূরপাল্লার পথ বহিয়া ইঁহার দুই মুখ মেঘনায় মিশিয়াছে। পল্লিরমণীর কাঁকনের দুই মুখের মধ্যে যেমন একটু ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি একটুখানি ফাঁক — কিন্তু কাঁকনের মতোই তার বলয়াকৃতি।

অনেক নদী আছে বর্ষার অকুণ্ঠ প্লাবনে ডুবিয়া তারা নিশ্চিহ্ন হওয়া যায়। পারের কোনো হদিস থাকে না, সবদিক একাকার। কেউ তখন বলিতে পারে না এখানে একটি নদী ছিল। সুদিনে আবার তাদের উপর বাঁশের সাঁকোর বাঁধ পড়ে। ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়িরা পর্যন্ত একখানা বাঁশে হাত রাখিয়া আর একখানা বাঁশে পা টিপিয়া টিপিয়া পার হইয়া যায়। ছেলে-কোলে নারীরাও যাইতে পারে। নৌকাগুলি অচল হয়। মাঝিরা কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সেগুলিকে টানিয়া নেয়। এপার ওপারে খেত। চাষিরা দিনের রোদে তাতিয়া কাজ করে। এপারের চাষি ওপারের জনকে ডাকিয়া ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করে। ওপারের চাষি ঘাম মুছিয়া জবাব দেয়। গোরুগুলি নামিয়া স্নান করিতে চেষ্টা করে। অবগাহন স্নান। কিন্তু গা ডোবে না। কাক-স্নান করামাত্র সম্ভব হয় কোনোরকমে। নারীরা কোমরজলে গা ডুবাইবার চেষ্টায় উবু হইয়া দুই হাতে ঢেউ তুলিয়া নীচু করা ঘাড়ে-পিঠে জল দিয়া স্নানের কাজ শেষ করে। শিশুদের ডুবিবার ভয় নাই বলিয়া মায়েরা তাদের জলে ছাড়িয়া দিয়াও নিরুদ্‌বেগে বাসন মাজে, কাপড় কাচে, আর এক পয়সা দামের কার্বলিক সাবানে পা ঘষে। অল্প দূরে ঘর। পুরুষমানুষে ডাক দিলে এখান হইতে শোনা যাইবে; তাই ব্যস্ততা নাই।

কিন্তু সত্যি কি ব্যস্ততা নাই? যে-মানুষটা এক-গা ঘাম লইয়া খেতে কাজ করিয়া বাড়ি গেল, তার ভাত বাড়িয়া দিবার লোকের মনের ব্যস্ততা থাকিবেইতো। দুপুরে নারীরা ঘাটে বেশি দেরি করে না। কিন্তু সকালে-সন্ধ্যায় দেরি করে। পুরুষেরা এজন্য কিছু বলে না। তারা জানে এ নদী দিয়া কোনো সওদাগরের নৌকার আসা-যাওয়া নাই।

শীতে বড়ো কষ্ট। গমগম করিয়া জলে নামিতে পারে না। জল খুব কম। সারা গা তো ডোবেই না; কোমর অবধিও ডোবে না। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা জলে হুম্ করিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিবার উপায় নাই; একটু একটু করিয়া শরীর ভিজে। মনে হয় একটু একটু করিয়া শরীরের মাংসের ভিতর ছুরি চালাইতেছে কেউ। চৈত্রের শেষে খরায় খাঁ খাঁ করে। এতদিন যে জলটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও একটু একটু করিয়া শুষিতে শুষিতে একদিন নিঃশেষ হইয়া যায়। ঘামের গা ধুইবার আর উপায় থাকে না। গোরুরা জল খাইতে ভুল করিয়া আসিয়া ভাবনায় কাতর হয়। মাঘের মাঝামাঝি সরষে ফুলে আর কড়াইমটরের সবুজিমায় দুই পারে নকশা করা ছিল। নদীতেও ছিল একটু জল। জেলেরা তিন-কোণা ঠেলা-জাল ঠেলিয়া চাঁদা, পুঁটি, ট্যাংরা কিছু কিছু পাইত। কিন্তু চৈত্রের খরায় এ সবের কিছুই থাকে না। মনে হয় মাঘ মাসটা ছিল এক স্বপ্ন। চারিদিক ধু-ধু রুক্ষতায় কাতরায়। লোকে বিচলিত হয় না। জানে তারা, এ সময় এমন হয়।

তিতাসের তেরো মাইল দূরে এমনই একটি নদী আছে। নাম বিজয় নদী। তিতাসের পারের জেলেদের অনেক কুটুম বিজয় নদীর পারের পাড়াগুলিতে আছে। তিতাসের পারের ওরা ওই নদীর পারের কুটুমবাড়িতে অনেকবার বেড়াইতে গিয়াছে। বিয়ের কনের খোঁজ গিয়াছে। সেসব গাঁয়ে তারা দেখিয়াছে, চৈত্রের খরায় নদী কত নিষ্করুণ হয়। একদিক দিয়া জল শুখায় আর একদিক দিয়া মাছেরা দম বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় নাক জাগাইয়া হাঁপায়। মাছেদের মতো জেলেদেরও তখন দম বন্ধ হইতে থাকে। সামনে মহাকালের শুষ্ক এক কঙ্কালের ছায়া দেখিয়া তারা একসময় হতাশ হইয়া পড়ে। তাদের কোনো চিন্তা থাকে না। হাতের টাকা ভাঙিয়া এই দুর্দিন পার করে। কিন্তু যারা বর্ষায় ঘরের মায়া ছাড়িয়া বাহির হয় নাই তারাই পড়ে বিপদে। নদী ঠনঠনে। জাল ফেলিবে কোথায়। তিন-কোণা ঠেলা-জাল কাঁধে ফেলিয়া আর-এক কাঁধে গলা চিপা ডোলা বাঁধিয়া এপাড়ায় সে-পাড়ায় টই-টই

করিয়া ঘুরিতে থাকে, কোথায় পানাপুকুর আছে, মালিকহীন ছাড়া বাড়িতে। চার পাড়ে বনবাদাড়ের ঝুপড়ি। তারই ঝরাপাতা পাড়িয়া, পচিয়া ভারী হইয়া তলায় শায়িত আছে। তারই উপর দিয়া ভাসিয়া উঠিয়া ছোটো মাছেরা ফুট দেয়। গলা-জল, শুকাইয়া কোমর-জল, কোমর-জল শুকাইয়া হাঁটু জল হইয়াছে। মাছেদের ভাবনার অন্ত নাই। কিন্তু অধিক ভাবিতে হয় না। গোপালকাছা-দেওয়া দীর্ঘাকার মালো কাঁধের জাল নামাইয়া শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাইতে তাকাইতে এক সময় খেউ দিয়া তুলিয়া ফেলে। মাছেদের ভাবনা এখানেই শেষ হয়, কিন্তু মাছ যারা ধরিল তাদের ভাবনার আর শেষ হয় না। তাদের ভাবনা আরও সুদূরপ্রসারী। সামনে বর্ষাকাল পর্যন্ত।

বর্ষাকালের আর খুব বেশি দেরি নাই। সংকট অবসানের সম্ভাবনায় অনেক মালো উদ্‌বেগের পাহাড় ঠেলিয়া চলিয়াছে, হাতে ঠেলা-জাল লইয়া চুনোপুঁটি যা পায় ধরিয়া পোয়া দেড়-পোয়া, চাউলের জোগাড় করিতেছে। কিন্তু গৌরাঙ্গ মালোর দিন আর চলিতে চায় না। একদিন অনেক খানাডোবায় খেউ দিয়া কিছুই পাইল না, নামিলে টগবগ করিয়া পচা জলের ভুরভুরি উঠে, আর খেউ দিলে তিন-চারিটা ব্যাং জাল হইতে লাফাইয়া এদিকে ওদিকে পড়িয়া যায়।

উঠানের একদিকে একটা ডালিম গাছ। পাতা শুখাইয়া গিয়াছে। গৌরাঙ্গসুন্দরের বউ লাগাইয়াছিল। বউ যৌবন থাকিতেই শুখাইয়া গিয়াছিল। গাল বসিয়া, বুক দড়ির মতো সরু হইয়া গিয়াছিল। বুকের স্তন দুটি বুকেই বসিয়া গিয়াছিল তার। তারপর একদিন সে মরিয়া গিয়াছিল। সে মরিয়া গিয়া গৌরাঙ্গকে বাঁচাইয়াছে। তার কথা গৌরাঙ্গসুন্দরের আর মনে পড়ে না। তারই মতো শুখাইয়া যাওয়া তারই হাতের ডালিম গাছটা চোখে পড়িতে আজ মনে পড়িয়া গেল। উঃ, বউটা মরিয়া কী ভালোই না করিয়াছে। থাকিলে আজ তার অবস্থা হইত ঠিক নিত্যানন্দ দাদার মতো।

নিত্যানন্দ থাকে উত্তরের ঘরে। তার বউ আছে। আর আছে একটি ছেলে, একটি মেয়ে। নিত্যানন্দ পরিবারের দিকে চাহিয়া গৌরাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এক পেটের ভাবনা নিয়াই বাঁচি না, দাদা চারিটা পেটের ভাবনা মাথায় করিয়া কেমন তামাক খাইতেছে। তার যেন কোনো ভাবনা নাই।

সত্যি নিত্যানন্দর আর কোনো ভাবনা নাই। যতই ভাবিয়াছে, দেখিয়াছে

কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। বউ ঝিমাইতেছে। ছেলেমেয়ে দুইটা নেতাইয়া পড়িয়া কীসের নির্ভরতায় অক্ষম নিত্যানন্দর মুখের দিকে চাহিয়া আছে। আর নিতানন্দ কোনো উপায় না দেখিয়া কেবল তামাক টানিতেছে।

পশ্চিমের ভিটায় গৌরাঙ্গসুন্দরের ঘর। ডালিম গাছে কাঁধের জাল ঠেকাইয়া দিয়া ডোলাটা ছুড়িয়া ফেলিল দাওয়ার একদিকে। দক্ষিণ ও পূর্বদিকের ভিটা খালি। তাদের দুই কাকা থাকিত। এক কাকা মরিয়া গিয়াছে এবং তার ঘর বেচিয়া তার শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে। আর-এক কাকা ঘর ভাঙিয়া লইয়া আর-এক গাঁয়ে ছাড়িয়া গিয়াছে।

গৌরাঙ্গ অকারণে খেঁকাইয়া উঠিল, "খালি তামুক খাইলে পেট ভরব?"

"কী খামু তবে?"

না, লোকটার কেবল পেটই শুখায় নাই। মাথাও শুখাইয়া গিয়াছে।

"চল যাই বুধাইর বাড়ি।"

নয়ানপুরে বোধাই মালো টাকায় সব মালোদের চেয়ে বড়ো। বাড়িতে চার-পাঁচটা ঢেউটিনের ঘর। দুই ছেলে রোজগারি লোক। বোধাই হাতির মতো মোটা ও কালো। শরীরেও হাতির মতো জোর। তার কারবার অন্য ধরনের। বড়ো বড়ো দিঘি ইজারা নিয়া মাছের পোনা ফেলে। মাছ বাড়িতে থাকে, আর তারা তিন বাপ বেটায় লোকজন লইয়া জাল ফেলে, মাছ তোলে, মাছ চালান দেয়। এ কাজে বোধাই অনেক লোকজন খাটায়। নদীতে জল না থাকিলে, মালোরা যখন দুই চোখে অন্ধকার দেখে তখন তারা যায় বোধইর বাড়িতে।

কিন্তু তিতাসে কত জল! কত স্রোত! কত নৌকা! সব দিক দিয়াই সে অকৃপণ।

আর বিজয় নদীর তীরে তীরে যে মালোরা ঘর বাঁধিয়া আছে, তাদের কত কষ্ট। নদী শুখাইয়া গেলে তাদের নৌকাগুলি অচল হইয়া থাকে আর কাঠফাটা রোদে কেবল ফাটে।

তিতাস-তীরের মালোরা যারা সেখানে বেড়াইতে গিয়াছে, চৈত্রের খরায় নদী কত নিষ্করুণ হয় দেখিয়া আসিয়াছে। রিক্ত মাঠের বুকে ঘূর্ণির বুভুক্ষা দেখিতে দেখিতে ফিরতি পথে তারা অনেকবার ভাবিয়াছে, তিতাস যদি কোনোদিন এইরকম করিয়া শুখাইয়া যায়। ভাবিয়াছে, এর আগেই হয়তো তাদের বুক শুখাইয়া যাইবে।

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ পাশের জনকে নিতান্ত খাপছাড়াভাবে বলিয়াছে : "বিজ্‌নার পারের মালো গুষ্টি বড়ো অভাগা রে ভাই, বড়ো অভাগা।"

যারা বিজয় নদীর দশা দেখে নাই, বছরের পর বছর কেবল তিতাসের তীরেই বাস করিয়াছে, তারা এমন করিয়া ভাবে না। তারা ভাবে তিন-কোনা ঠেলা-জাল আবার একটা জাল। তারে হাঁটু-জলে ঠেলিতে হয়, ওঠে চিংড়ির বাচ্চা। হাত তিনেক তো মোটে লম্বা। বিজয়ের বুকে তা-ই ডোবে না। তিতাসের জলে কত বড়ো বড়ো জাল ফেলিয়া তারা কত রকমের মাছ ধরে। এখানে যদি তিতাস নদী না থাকিত, বিজয় নদী থাকিত, তবে নাকের চারিদিক থেকে বায়ুটুক সরাইয়া রাখিলে যা অবস্থা হয়, তাদের ঠিক সেইরকম অবস্থা হইত। ওদের মতে ঠেলা-জাল ঘাড়ে করিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরের খানা-ডোবা খুঁজিয়া মরিতে হইত দুই আনা আর দশ পয়সার মোরলা ধরিবার জন্য।

জেলেদের বউ-ঝিরা ভাবে অন্যরকম কথা — বড়ো নদীর কথা যারা শুনিয়াছে। যেসব নদীর নাম মেঘনা আর পদ্মা। কী ভীষণ। পাড় ভাঙে। নৌকা ডোবায়। কী ঢেউ। কী গহিন জল। চোখে না দেখিয়াই বুক কাঁপে। কত কুমির আছে সেসব নদীতে। তাদের পুরুষদের মাছ ধরার জীবন। রাতে বেরাতে তারা জলের উপরে থাকে। এতবড়ো নদীতে তারা বাহির হইত কী করিয়া! তাদের নদীতে পাঠাইয়া মেয়েরা ঘরে থাকিতই বা কেমন করিয়া! তিতাস কত শান্ত। তিতাসের বুখে ঝড়-তুফানের রাতেও স্বামী-পুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না। বউরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে, মায়েরা ভাবে ছেলেরা ঠিক মায়েরই বুকে মাথা এলাইয়া দিয়া শান্ত মনে মাছ-ভরা জাল গুটাইতেছে।

আপদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ এবং বিদ্যুতের ঝিকমিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মতো দিগ্‌বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল এবং বাগানের বড়ো বড়ো গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝটপট করিয়া হাহুতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রী-পুরুষে কথাবার্তা চলিতেছিল।

শরৎবাবু বলিতেছিলেন, "আর কিছুদিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব।"

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, "আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোনো ক্ষতি হইবে না।"

বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দুরূহ নয়, তথাপি বাদপ্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মতো ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরৎ কহিলেন, "ডাক্তার বলিতেছে, আর কিছুদিন থাকিয়া গেলে ভালো হয়।"

কিরণ কহিলেন, "তোমার ডাক্তার তো সব জানে!"

শরৎ কহিলেন, "জানো তো, এই সময়ে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভালো হয়।"

কিরণ কহিলেন, "এখানে এখন বুঝি কোথাও কাহারও কোনো ব্যামো হয় না!"

পূর্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালোবাসে, এমনকি শাশুড়ি পর্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল এবং ডাক্তার যখন বায়ু পরিবর্তনের প্রস্তাব করিল তখন গৃহ এবং কাজকর্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ি কোনো আপত্তি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই, বায়ু পরিবর্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থুল করিয়া তোলা নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর এবং এমন কোনো দেশ আছে কি যেখানে অদৃষ্টের লিপি সফল হয় না — তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে-সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাঁহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয় ব্যক্তির বিপদে মানুষের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন এবং কিরণও রোগমুক্ত হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকরুণ কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্পসহ মনে উদয় হয়, আহা, বড়ো রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সঙ্গপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভালো লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই; কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্‌ণ শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন চায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্যপালন করো — ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুদ্ধগৃহে স্বামী-স্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয়পক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল তখন দুর্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোনো অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কী একটা নিবেদন করিল।

শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকাডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণ বালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান-অভিমান দুর হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শুষ্ক বস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন এবং শীঘ্র একবাটি দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনও উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিলেন, সে যাত্রার দলের ছোকরা, তাহার নাম নীলকান্ত। তাহার নিকটবর্তী সিংহবাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহূত হইয়াছিল; ইতোমধ্যে নৌকাডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কী গতি হইল কে জানে; সে ভালো সাঁতার জানিত, কোনোমতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর-একটু হইলেই সে মারা পড়িত, এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরৎ মনে করিলেন, হইল ভালো, কিরণ একটা নতুন কাজ হাতে পাইলেন, এখন কিছুকাল এইভাবে কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ বালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশায় শাশুড়িও প্রসন্নতা লাভ করিলেন এবং অধিকারী মহাশয় ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনী পরিবারের হাতে বদলি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাঁহার মাতার মত পরিবর্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন, আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়গুড়িতে ফড়্ ফড়্ শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার শখের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নববন্ধু সঞ্চয় চেষ্টায় পল্লিতে পর্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনই স্পর্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহূত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্মল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমন সংবাদ স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্ত শিশুসম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল এবং সে

বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড়ো বেশি আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নুতন ধুতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন তখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার স্নেহ এবং কৌতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলো চুল চিরিয়া-চিরিয়া ঘষিয়া-ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত — এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাঁহার সহিত একাসনে দর্শকশ্রেণিভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পাইত না। শাশুড়ি এক-একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন, কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কানমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনাজনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর জলস্থলবিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চোদ্দো-পনেরো হয় তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে, যদি সতেরো-আঠারো হয় তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকালপক্ক, নয় সে অকাল-অপক্ক।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা দময়ন্তী সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যক মতো বিধাতার বরে খানিক দূর পর্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটোই দেখিত, আপনাকে সে ছোটোই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এইসকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণ প্রভাবে সতেরো বৎসর

বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্কে সতেরোর অপেক্ষা অতি-পরিপক্ক চোদ্দোর মতো দেখাইত। গোঁফের রেখা না উঠাতে এই ভ্রম আরো দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হউক, বা বয়সানুচিত ভাষা প্রয়োগবশতই হউক, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশি পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দুইটি চক্ষুর মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবত কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্বতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎবাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়া ছিল এখানে আসিয়া সেটা কখন এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো-আঠোরো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রী বেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়োই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয়, এ কথা কিছুতেই তাহার মনে লইত না।

এমনকি, সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সংকল্প করিল। কিন্তু বউঠাকরুনের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনা কোনো কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিত; জল ছলছল করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখি কিচমিচ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কী ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর-একটা কথায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত না, অথচ 'বই পড়িতেছি' মনে করিয়া তাহার ভারী একটা আত্মগৌরব উপস্থিত হইত। সামনে দিয়া যখন একটা নৌকা

যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মতো যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক, বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত

ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে
এমন নৃশংস কেন হলি রে —
হল কী জন্যে, এ অরণ্যে,
রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে —

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত; তখন চারিদিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তরজমা হইয়া একটু নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কী মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলে পিতৃমাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মিলন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া রাজপুত্র রাজকন্যা এবং সাত-রাজার-ধন মাণিকের কথা শোনে তখন সেই ক্ষীণ দীপালোকিত জীর্ণ গৃহকোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত — জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখির ডাক এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদলকোমল রক্তিম চরণযুগল কী এক মায়ামন্ত্রবালে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আবার এক সময় এই গীতমরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগক্রমে শরৎ আসিয়া

তাহার গালে ঠাস ঠাস করিয়া চড় কষাইয়া দিতেন এবং বালক-ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা-কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারী খুশি হইলেন, তাঁহার হাতে আর-একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিঁদুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনও তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনও ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পুরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্ত দিন তর্জন ধাবন হাস্য, এমনকি, মাঝে মাঝে কহল ক্রন্দন সাধাসাধি এবং পুনরায় শন্তি-স্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কী ভূতে পাইল কে জানে। সে কী উপলক্ষ্য করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশি কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমনকি পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখাচ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভালো খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালোবাসেন। ভালো খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্তের ছিল; সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃ পুন খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এইজন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণ বালকের তৃপ্তিপূর্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশত নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত; পূর্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না, সে সর্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলসুদ্ধ খাইয়া তবে উঠিত। কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত, তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উচিত, না খাইয়া

উঠিয়া পড়িত; বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত, "আমার ক্ষুধা নাই"। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুতপ্ত চিত্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন এবং খাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে-অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে, "আমার ক্ষুধা নাই"। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়া পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কী তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবি, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে। যখন কেহই আসে না, তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমলকরস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল, সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্বদাই লাগায়; যেদিন কিরণ কোনো কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সেদিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত একমনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, "আর-জন্মে আমি যেন সতীশ হই এবং সতীশ যেন আমি হয়।" সে জানিত, ব্রাহ্মণের একান্ত মনের অভিশাপ কখনো নিষ্ফল হয় না, এইজন্য সে মনে মনে সতীশকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে গিয়া নিজে দগ্ধ হইতে থাকিত এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বউঠাকুরানির উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যমিশ্রিত পরিহাস কলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টত সতীশের কোনোরূপ শত্রুতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমতো তাহার ছোটোখাটো অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত; সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত, সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ শখের চিকনের কাজ করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে; ভাবিল, হাওয়ায় উড়িয়ায় উড়িয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন্ দিক হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন; নীলকান্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর আবার কী হল রে"। নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, "সেই গানটা গা-না।" "সে আমি ভুলে গেছি" বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল; সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোনো কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে, সে প্রশ্নমাত্র কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে শাশুড়ি, স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণ তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দুই দিন আগে ব্রাহ্মণ বালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কয়দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোখ ছলছল করিয়া উঠিল; যাহাকে চিরকাল কাছে রাখা যাইবে না, তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভালো হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল; সে অত বড়ো ছেলের কান্না দেখিয়া ভারী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে মোলো ! কথা নাই, বার্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির !"

কিরণ এই কঠোর উক্তির জন্য সতীশকে ভর্ৎসনা করিলেন। সতীশ কহিল, "তুমি বোঝো না বউদিদি, তুমি সকলকেই বড়ো বেশি বিশ্বাস করো; কোথাকার কে তার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মূষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়াকান্না জুড়িয়াছে — ও বেশ জানে যে, দুফোঁটা চোখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।"

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাল্পনিক মূর্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিঁধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি শৌখিন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসানো এবং মাঝে একটা জর্মন রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চুপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে; সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল, প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল দিয়া অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোঁছ করিত। কিরণ প্রায় পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহংসের চঞ্চুঅগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন, "ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হলি রে" এবং ইহাই উপলক্ষ্য করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকের বাগ্‌যুদ্ধ চলিত।

স্বদেশে যাত্রার আগের দিন সকাল বেলায় সে জিনিসটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, "ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর অন্বেষণে উড়িয়াছে।"

কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না। — গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘুরঘুর করিতে দেখিয়াছে, এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার দোয়াত চুরি করে কোথায় রেখেছিস, এনে দে।"

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে যখন তাহার নামে দোয়াত-চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড়ো বড়ো দুই চোখ আগুনের মতো জ্বলিতে লাগিল; তাহার বুকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল; সতীশ আর-একটা কথা বলিলেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রুদ্ধ বিড়ালশাবকের মতো সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্টস্বরে বলিলেন, "নীলু, যদি সেই দোয়াতটা নিয়ে থাকিস আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বলবে না।"

নীলকান্তের চোখ ফাটিয়া টসটস করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাইরে আসিয়া বলিলেন, "নীলকান্ত কখনোই চুরি করেনি।"

শরৎ এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয় নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করেনি।"

কিরণ সবলে বলিলেন, "কখনোই না।"

শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া সওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, "না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।"

সতীশ কহিলেন, "উহার ঘর এবং বাক্স খুঁজিয়া দেখা উচিত।"

কিরণ বলিলেন, "তাহা যদি কর তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দোষীর প্রতি কোনোরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর আশ্রুজলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভালো দুইজোড়া ফরাসডাঙার ধুতি-চাদর, দুটি জামা, একজোড়া নূতন জুতা এবং একখানি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহারগুলি আস্তে আস্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত।

আঁচল হইতে চাবির গোছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খুলিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগুলি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সার মধ্যে লাটাই, কঞ্চি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক, ভাঙা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানাজাতীয় পদার্থ স্তূপাকারে রক্ষিত।

কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভালো করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিস ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশ্যে বাক্সাটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাঠিম, ছুরি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল: তারপরে খানকয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুযত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্য হইয়া আরক্তিম মুখে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্ত দেখিল, মনে করিল কিরণ স্বয়ং চোরের মতো তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে কেবল সামান্য চোরের মতো লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাসাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ওই জিনিসটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্তের দুর্বলতাবশত ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সের মধ্যে পুরিয়াছে, এ-সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে। সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কী! কেমন করিয়া বলিবে সে কী। সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন, এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেরিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সের ভিতরে রাখিলেন। চোরের মতো তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপরে বালকের লাটাই লাঠিম ঝিনুক কাচের টুকরো প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন এবং সর্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণ বালকের কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; পুলিশ বলিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন শরৎ বলিলেন, "এইবার নীলকান্তের বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।"

কিরণ জেদ করিয়া বলিলেন, "সে কিছুতেই হইবে না।" বলিয়া বাক্সটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াতটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরৎ সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান একদিনে শূন্য হইয়া গেল; কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, খুঁজিয়া খুঁজিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

পরশুরাম

মাঘ মাস, ১৩২৬ সাল। এই মাত্র আরমানি গির্জার ঘড়িতে বেলা এগারোটা বাজিয়াছে। শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ হাতে ঝুলাইয়া জুডাস লেনের একটি তেতলা বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। বাড়িটি বহু পুরাতন, ক্রমাগত চুন ও রঙের প্রলেপে লোলচর্ম কলপিত-কেশ বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীচের তলায় অন্ধকারময় মালের গুদাম। উপরতলায় সম্মুখভাগে অনেকগুলি ব্যবসায়ীর আপিস, পশ্চাতে বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক পৃথক অংশে বাস করেন। প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই তেতলা পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের দেয়াল আগাগোড়া তাম্বুলরাগচর্চিত — যদিও নিষেধের নোটিশ লম্বিত আছে। কতিপয় নেংটে ইঁদুর ও আরশোলা পরস্পর অহিংসভাবে স্বচ্ছন্দে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রমমৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক, সিঁড়ির যাত্রীগণকে গ্রাহ্য করে না। অন্তরালবর্তী সিন্ধি-পরিবারের রান্নাঘর হইতে নির্গত হিঙের তীব্র গন্ধের সহিত নর্দমার গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত করিয়াছে। আপিসসমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া কেনা-বেচা-তেজি-মন্দি আদায়-উসুল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিনযাপন করিতেছেন।

শ্যামবাবু তেতলা উঠিয়া একটি ঘরের তালা খুলিলেন। ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে — ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল, জেনার্ল মার্চেন্টস। এই কারবারের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামবাবু (শ্যামলাল গাঙ্গুলি) এবং তাঁহার শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি এস-সি। ঘরে কয়েকটি পুরাতন টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি আপিস-সরঞ্জাম। টেবিলের উপর নানাপ্রকার খাতা, বিতরণের জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিরেক্টরি, একখণ্ড ইন্ডিয়ান কোম্পানিজ অ্যাক্ট, কয়েকটি বিভিন্ন কোম্পানির নিয়মাবলি বা articles এবং অন্যবিধ কাগজপত্র। দেয়ালে সংলগ্ন তাকের উপর কতকগুলি ধূলিধূসর কাগজমোড়া শিশি

এবং শূন্যগর্ভ মাদুলি। এককালে শ্যামবাবু পেটেন্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধের কারবার করিতেন, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি, আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক, কিন্তু এ পর্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ই বি রেলওয়ে অডিট আপিসের চাকরিই তাঁহার জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে, কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরির অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন — এ বিষয়ে শ্যালক বিপিনই তাঁহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার বাসায় পত্নী এবং শ্যালকসহ বাস করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইলেই চাকরি ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া নূতন উদ্যমে ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল নামে আপিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্যামবাবু ধর্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন এবং অবসর মতো তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা — অর্থাৎ ক্ষুধা না থাকিলে— মাংসভোজন এবং অকারণে কারণ পান করেন না। কোন্ সন্ন্যাসী সোনা করিতে পারে, কাহার নিকট দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে, এই সকল সন্ধান প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু আজকাল মধ্যে মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন এবং অচিরে এই নামে সর্বত্র পরিচিত হইবেন এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাঁহার আপিস ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি সার্ধ-ত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন — "বাঞ্ছা, ওরে বাঞ্ছা"। বাঞ্ছা শ্যামবাবুর আপিসের বেয়ারা — এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিতেছিল — প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন — "গঙ্গাজলের বোতলটা আন্, আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ, যা ধুলো হয়েছে।" বাঞ্ছা একটা তামার কুপি আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দূর-চর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। স্ট্যাম্পে

১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্যোদ্ধার হয়। এই শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন — 'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেন্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।

উক্ত প্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া শ্যামবাবু প্রসন্নচিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া লইয়া সংশোধন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশমশ শব্দ করিতে করিতে অটলবাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন, — "এই যে শ্যামদা, অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি? বড়ো দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না — হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদার-ইন-ল কোথায়?"

শ্যামবাবু। বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল বলে।

অটলবাবু চাপকান চোগা-ধারী সদ্যোজাত অ্যাটর্নি, পিতার আপিসে সম্প্রতি জুনিয়ার পাটনাররূপে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পরিপক্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন — "বুড়ো রাজি হল? আচ্ছা, ওকে ধরলেন কী করে?"

শ্যাম। আরে তিনকড়িবাবু হলেন গে শরতের খুড়শ্বশুর। বিপিনের মাসতুতো ভাই শরৎ। ওই শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকড়িবাবুকে ধরি। সহজে কি রাজি হয়? বুড়ো যেমন কঞ্জুস তেমনি সন্দিগ্ধ। বলে — আমি হলুম রায়সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি, গভরমেন্টের কাছে কত মান। কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে কি শেষে পেনশন খোয়াব? তখন নজির দিয়ে বোঝালুম — কত রিটায়ার্ড বড়ো বড়ো অফিসার তো ডিরেক্টরি করছেন, আপনার কীসের ভয়? শেষে যখন শুনলে যে, প্রতি মিটিংয়ে ৩২ টাকা ফি পাবে, তখন একটু ভিজল।

অটল। কত টাকার শেয়ার নেবে?

শ্যাম। তাতে বড়ো হুঁশিয়ার। বলে — তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে লুট করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভগ্নীপতি মিলে ম্যানেজিং এজেন্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে আমার টাকা কোথায় থাকবে? বললুম — মশায়, আপনার মতো বিচক্ষণ সাবধানি ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য লুঠ করে। খরচপত্র তো আপনার চোখের সামনেই হবে। ফেল হতে দেবেন কেন? মন্দটা যেমন ভাবছেন, ভালোর দিকটাও দেখুন। কী রকম লাভের ব্যবসা! খুব কম করেও যদি ৫০ পারসেন্ট

ডিভিডেন্ড পান তবে দু-বছরের মধ্যেই তো আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বললে — আচ্ছা, আমি শেয়ার নেব কিন্তু বেশি নয়, ডিরেক্টর হতে হলে যে টাকা দেওয়া দরকার তার বেশি নেব না। আজ মত স্থির করে জানাবেন, তাই বিপিনকে পাঠিয়েছি।

আটল। এমন খুঁতখুঁতে লোক নিয়ে ভালো করলেন না শ্যামদা। আচ্ছা, মহারাজকে ধরলেন না কেন?

শ্যাম। মহারাজকে ধরতে বড়ো শিকারি চাই, তোমার আমার কর্ম নয়। তা ছাড়া পাঁচ ভূতে তাঁকে শুষে নিয়েছে, কিছু আর পদার্থ রাখেনি।

অটল। খোট্টাটি ঠিক আছে তো? আসবে কখন?

শ্যাম। সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই তো সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রসপেক্টসটা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়িবাবুকে আসতে বলেছিলুম, বাতে ভুগছেন, আসতে পারবেন না জানিয়েছেন।

"রাম রাম বাবুসাহব!"

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কালো বনাতের কোট, পায়ে বার্নিশ-করা জুতা, মাথায় হলদে রঙের ভাঁজ-করা মখমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কানে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যামবাবু বলিলেন — "আসুন, আসুন — ওরে বাঞ্ছা, আর একটা চেয়ার দে। এই ইনি হচ্ছেন অটলবাবু, আমাদের সলিসিটার দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু — বাবু গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া।"

গণ্ডেরি। নোমোস্কার, আপনের নাম শুনা আছে, জানপহ্চান হয়ে বড়ো খুশি হল।

অটল। নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা বসে আছি। আপনার মতো লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কী?

গণ্ডেরি। হেঁ হেঁ, সোকোলি ভগবানের হিঞ্ছা। হামি একেলা কী করতে পারি? কুছু না।

শ্যাম। ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী। দেখো অটল, গণ্ডেরিবাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার তা মনে করো না। ইংরেজি ভালো না জানলেও ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রেও বেশ দখল আছে।

অটল। বাঃ, আপনার মতো লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড়ো সুখী হলুম।

আচ্ছা, মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখলেন কী করে?

গন্ডেরি। বহুত বাঙালির সঙে হামি মিলামিশা করি। বাংলা কিতাব ভি অন্‌হেক পঢ়েছি। বঙ্কিমচন্দ্, রবীন্দরনাথ, আউর ভি সব।

এমন সময় বিপিনবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ইনি একটু সাহেবি মেজাজের লোক, এককালে বিলাত যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিধানে সাদা প্যান্ট, কালো কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্ট হ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, গোঁফের দু-প্রান্ত কামানো। শ্যামবাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, — "কী হল?"

বিপিন। ডিরেক্টর হবেন বলেছেন, কিন্তু মাত্র দু-হাজার টাকার শেয়ার নেবেন। তোমাকে অটলকে আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এই নাও চিঠি।

আটল। তিনকড়িবাবু হঠাৎ এত সদয় যে?

শ্যাম। বুঝলুম না। বোধ হয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই করে নিতে চান।

অটল। যাক, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরান্ডম আর আর্টিকেলসের মুসাবিদা এনেছি। শ্যামদা, প্রসপেক্টসটা কীরকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম। হ্যাঁ, সকলে মন দিয়ে শোনো। কিছু বদলাতে হয় তো এই বেলা। দুর্গা—দুর্গা—

জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ
১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত
শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

মূলধন — দশ লক্ষ টাকা, ১০৲ হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশ পিছু ২৲ প্রদেয়। বাকি টাকা চার কিস্তিতে তিন মাসের নোটিশে প্রয়োজন মতো দিতে হইবে।

অনুষ্ঠানপত্র

ধর্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোনো কর্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন — ধর্মের ফল পরলোকে লভ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুত ধর্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। এতদর্থে সদ্য সদ্য চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কীরূপ বিপুল আয় তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশের একটি দেবমন্দিরের দৈনিক যাত্রীসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোকপিছু চার আনা আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তেরো লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক, যথেষ্ট টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্মপ্রাণ শেয়ারহোল্ডারগণের অর্থে একটি মহান তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং জাগ্রত দেবী সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টের হস্তে কার্যনির্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনো প্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ারহোল্ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেন্ড পাইবেন এবং একধারে ধর্ম অর্থ মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ডিরেক্টরগণ। — (১) অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায়সায়েব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বিখ্যাত ব্যবসাদার ও ক্রোরপতি শ্রীযুক্ত গন্ডেরিরাম বাটপারিয়া। (৩) সলিসিটর্স দত্ত অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত, MA, BL। (৪) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার বি সি চৌধুরী, B Sc, A S S (USA)। (৫) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ (ex-officio)।

অটলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন — "বিপিন আবার নতুন টাইটেল পেলে কবে?"

শ্যাম। আর বলো কেন। পঞ্চাশ টাকা খরচ করে আমেরিকা না কামস্কাটকা কোথা থেকে তিনটে হরফ আনিয়েছে।

বিপিন। বা, আমার কোয়ালিফিকেশন না জেনেই বুঝি তারা শুধু শুধু একটা ডিগ্রি দিলে? ডিরেক্টর হতে গেলে একটা পদবি থাকা ভালো নয়?

গন্ডেরি। ঠিক বাত। ভেক বিনা ভিখ মিলে না। শ্যামবাবু, আপনিও এখন্‌সে ধোতি-উতি ছোড়ে লঙোটি পিনহুন।

শ্যাম। আমি তো আর নাগা সন্ন্যাসী নই। আমি হলুম শক্তিমন্ত্রের সাধক, পরিধেয় হল রক্তাম্বর। বাড়িতে তো গৈরিকই ধারণ করি। তবে আপিসে পরে আসি না, কারণ, ব্যাটারা সব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আর-একটু লোকের চোখ-সহা হয়ে গেলেই সর্বদাই গৈরিক পরব। যাক, পড়ি শোন —

মেসার্স ব্রহ্মচারী ব্রাদার-ইন-ল এই কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সি লইতে

স্বীকৃত হইয়াছেন — ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহারা লাভের শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিশন লইবেন এবং যতদিন না —

অটলবাবু বলিলেন — "কমিশনের রেট অত কম ধরলেন কেন? দশ পার্সেন্ট অনায়াসে ফেলতে পারেন।"

গন্ডেরি। কুছ দরকার নেই। শ্যামবাবুর পরবস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশনের ইরাদা থোড়াই করেন।

এবং যতদিন না কমিশনে মাসিক ১০০০৲ টাকা পোষায়, ততদিন শেষোক্ত টাকা অ্যালাউয়েন্স রূপে পাইবেন।

গন্ডেরি। শুনেন অটলবাবু, শুনেন। আপনি শ্যামবাবুকে কী শিখ্‌লাবেন?

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী গেবিন্দপুর গ্রামে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন দেবত্র সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্প্রতি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন যে উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অধুনা সর্বপীঠের সমন্বয় হইয়াছে এবং মাতা তাঁহার মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী অবলা বিধায় এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগ বিধায়, উক্ত দেবত্র সম্পত্তি মায় মন্দির বিগ্রহ জমি আওলাত আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।

অটল। নিস্তারিণী দেবী আবার কোথা থেকে এলেন? সম্পত্তি তো আপনার বলেই জানতুম।

শ্যাম। উনি আমার স্ত্রী। সেদিন তাঁর নামেই সব লেখাপড়া করে দিয়েছি। আমি এসব বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে চাই না।

গন্ডেরি। ভালো বন্দোবস্ত্ কিয়েছেন। আপনেকো কোই দুস্‌বে না। বিস্তার্ণী দেবীকো কোন্ পহ্‌চানে। দাম কেতো লিচ্ছেন?

অতঃপর তীর্থপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরনির্মাণ, দেবসেবাদি কোম্পানি কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং এতদর্থে কোম্পানি মাত্র ১৫,০০০৲ টাকা পণে সমস্ত সম্পত্তি খরিদার্থে বায়না করিয়াছেন।

গন্ডেরি। হদ্দ্ কিয়া শ্যামবাবু! জঙ্গাল কি ভিতর পুরানা মন্দিল, উস্‌মে দো-চার শও ছুছুন্দর, ছটাক ভর জমিন, উস্‌পর দো-চার বাঁশ ঝাড় — বস্, ইসিকা দাম পন্দ্র হজার!

শ্যাম। কেন, অন্যায়টা কী হল? স্বপ্নাদেশ, একান্ন পীঠ এক ঠাঁই, জাগ্রত দেবী — এসব বুঝি কিছু নয়? গুডউইল হিসেবে পনেরো হাজার টাকা খুবই কম।

গন্ডেরি। অচ্ছা। যদি কোই শেয়ারহোল্ডার হাইকোর্ট মে দরখাস্ত পেশ করে — স্বপন-উপন সব ঝুট্‌ ছক্‌লায়কে রূপয়া লিয়া — তব্‌?

অটল। সে একটা কথা বটে, কিন্তু এইসব আধিদৈবিক ব্যাপার বোধ হয় অরিজিনাল সাইডের জুরিসডিকশনে পড়ে না। আইন বলে — Caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা সাবধান! সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই করোনি কেন? যা হোক একবার expert opinion নেব।

শীঘ্রই নূতন দেবালয় আরম্ভ হইবে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দির, নহবতখানা, ভোগশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৃহাদিও থাকিবে। আপাতত দশ হাজার যাত্রীর উপযুক্ত অতিথিশালা নির্মিত হইবে। শেয়ারহোল্ডারগণ বিনা খরচায় সেখানে সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। হাট বাজার যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন যথেষ্ট থাকিবে। যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধপ্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে। মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ৺সেবার ভর লইবেন।

যাত্রীগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আরও নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্ভিন্ন by-product recovery-র ব্যবস্থা থাকিবে। ৺সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলিতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগসমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।

গন্ডেরি। বক্‌ড়ি মারবেন? হামি ইসমি নহি, রামজি কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে দিন।

শ্যাম। আপনি তো আর নিজে বলি দিচ্ছেন না। আচ্ছা, না হয় কুমড়ো-বলির ব্যবস্থা করা যাবে।

অটল। কুমড়োর চামড়া তো ট্যান হবে না। আয় কমে যাবে। কী হে বৈজ্ঞানিক,

কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পারো?

বিপিন। কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধ হয় ভেজিটেবল শু হতে পরে। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব!

গন্ডেরি। জো খুশি করো। হমার কী আছে। হামি থোড়া রোজ বাদ আপ্‌না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে কোম্পানির বাৎসরিক লাভ অন্তত ১২ লক্ষ টাকা হইবে এবং অনায়াসে ১০০ পারসেন্ট ডিভিডেন্ড দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলে অ্যালটমেন্ট হইবে। সত্বর শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই সুবর্ণসুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গন্ডেরি। লিখে লিন — ঢাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকি দেড় লাখ শ্যামবাবু বিপিনবাবু অটলবাবু সমান হিস্‌সা লিবেন।

শ্যাম। পাগল আর কি! আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না হয় বড়োলোক আছেন।

গন্ডেরি। হামি-শালা রুপয়া ডালবো আর তুমি লোগ মৌজ করবে? সো হোবে না। সব্‌কা ঝোঁখি লেনা পড়েগা। শ্যামবাবু মতলব সমঝ্‌লেন না? টাকা কোই দিব না। সব হাওলাতি থাকবে। মেনেজিং এজিন্ট মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যামদা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেন্টসদের কাছ থেকে কর্জ করে নিজের নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্ছি; আবার কোম্পানি ওই টাকা ম্যানেজিং এজেন্টসদের কাছে গচ্ছিত রাখছে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্ছেন না, টাকাটা কেবল খাতাপত্রে জমা থাকবে।

শ্যাম। তারপর তাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হলে আমি মারা যাই আর কি! বাকি কলের টাকা দেব কোথা থেকে?

গন্ডেরি। ডরেন কোনো? শেয়ার পিছ তো অভি দো টাকা দিতে হোবে। ঢাই লাখ টাকার শেয়ারের সির্ফ পচাশ হজার দেনা হোয়। প্রিমিয়ম মে সব বেচে দিব — সুবিস্তা হোয় তো আউর ভি শেয়ার ধরে রাখবো। বহুত মুনাফা মিলবে। চিম্‌ড়িমল ব্রোকারসে হামি বন্দোবস্ত কিয়েছি। দো চার দফে হম লোগ আপ্‌না আপ্‌নি শেয়ার লেকে খেলবো, হাঁথ বাদলাবো, দাম চঢ়বে, বাজার গরম হোবে। তখন সব কোই শেয়ার মাংবে, দাম কা বিচার করবে না। কবিরজি কি বচন শুনিয়ে —

ঐসী গতি সন্‌সারমে যো গাড়র কি ঠাট।

একা পড়া যব গাঢ়মে সবৈ যাত তেহি বাট।।

মনে হচ্ছে — সন্‌সারের লোক সব যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খাদ্দেমে গির পড়ে তো সব কোই উসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন — "তারা ব্রহ্মময়ী, তুমিই জানো। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ তুমিই উদ্ধার করে দাও মা — অধম সন্তানকে যেন মেরো না।"

গন্ডেরি। শ্যামবাবু, মন্দিল-উন্দিলকা কোম্পানি যো কর্‌না হ্যায় কিজিয়ে। উস্‌কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কী চিজ?

গন্ডেরি। ঘই জানেন না? ঘিউ হচ্ছে আস্‌লি চিজ — যো গায় ভঁইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নক্‌লি যো হ্যায় সো ঘই কহ্‌লাতা। চর্বি, চিনাবাদাম তেল ওগায়রহ্ মিলা কর্ বনায়া যাতা। পর্ সাল হামি ঘই-এর কামে পচিশ হজার লাগাই, সাঢ়ে চৌবিশ হজার মুনাফা মিলে।

অটল। উঃ বিস্তর সাপ মেরেছিলেন বলুন!

গন্ডেরি। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিলবে? উ সব ঝুট বাত।

অটল। আচ্ছা গন্ডারজি —

গন্ডেরি। গন্ডার নেহি, গন্ডেরি।

অটল। হাঁ হাঁ, গন্ডেরিজি। বেগ ইওর পার্ডন। আচ্ছা, আপনি তো নিরামিষ খান, ফোঁটা কাটেন, ভজন-পূজনও করেন।

গন্ডেরি। কেনো করবো না? হামি হর্ রোজ গীতা আউর রামচরিতমানস পঢ়ি, রামভজন ভি করি।

আটল। তবে অমন পাপের ব্যবসাটা করলেন কী বলে?

গন্ডেরি। পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকাত্তা, ঘই বনে হাথরস্‌মে। হামি ন আঁখসে দেখি, ন নাকসে শুংখি — হলুমানজি কিরিয়া। হামি তো সির্ফ্ মহাজন আছি — রুপয়া দে কর্ খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুসরা ধনীসে লিবে। পাঁপ হোবে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কী? যদি ফিন কুছ

দোষ লাগে — জানে রন্‌ছোড়জি — হামার পুন্‌ভি থোড়া-বহুত জমা আছে। একাদ্‌সী, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাঁস, দান-খয়রাত ভি কুছু করি। আট আটঠো ধরমশালা, বানোআয়া — লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে —

অটল। লিলুয়ার ধর্মশালা তো আশরফিলাল ঠুনঠুনওয়ালা করেছে।

গন্ডেরি। কিয়েছে তো কী হইয়েছে। সভি তো ওহি কিয়েছে। লেকিন বানিয়ে দিয়েছে কোন্? তদারক কোন্ কিয়েছে? ঠিকাদার কোন্ লাগিয়েছে? সব হামি। আশরফি হমার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্ দিয়েছি তব্ না রুপয়া খরচ কিয়েছে!

অটল। মন্দ নয়, টাকা ঢাললে আশরফি, পুণ্য হল গন্ডেরির।

গন্ডেরি। কোনো হোবে না? দো দো লাখ রুপয়া হর্ জগেমে খরচ দিয়া। জোড়িয়ে তো কেতনা হোয়। উস পর কম্‌সে কম সঁয়কড়া পাঁচ রুপয়া দুস্তুরি তো হিসাব কিজিয়ে। হাম তো বিলকুল ছোড় দিয়া। আশরফিলালকা পুন্ যদি সোলহ্ লাখকা হোয়, মেরা ভি অস্‌সি হজার মোতাবেক হোনা চাহ্‌তা।

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা। পুণ্যেরও দেখছি দালালি পাওয়া যায়। আমাদের শ্যামদা গন্ডেরিদা যেন মানিকজোড়।

গন্ডেরি। অটলবাবু, আপনি দো-চার অংরেজি কিতাব পঢ়িয়ে হামাকে ধরম কী শিখ্‌লাবেন? বঙ্গালি ধরম জানে না। তিস রুপয়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রুপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন্ ভি করে হিসাবসে। আপ্‌নেদের রবীন্দরনাথ কি লিখছেন —

রৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নহি।

হামি এখ্‌ন চলছি, রেস খেলনে। কোন্ট্রি গেরিল ঘোড়ে পর্ আজ দো-চারশও লাগিয়ে দিব।

অটল। আমিও উঠি শ্যামদা। আর্টিকেলের মুসাবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রস্‌পেক্টস তো দিব্বি হয়েছে। একটু-আধটু বদলে দেব এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার।

বাগবাজারে গলির ভিতর রায়সাহের তিনকড়িবাবুর বাড়ি। নীচের তলায় রাস্তার সম্মুখে নাতিবৃহৎ বৈঠকখানা ঘরে গৃহকর্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গল্পে নিরত, অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ

রবিবার, তাড়া নাই, বেলা অনেক হইয়াছে।

তিনকড়িবাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তামাকের ধোঁয়ার পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে — কথা কহিবার সময় আরশোলার দাড়ার মতো নড়ে। তিনি দৈব ব্যাপারে বড়ো একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কোম্পানিতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু আজ কালীঘাট হইতে প্রত্যাগত সদ্যস্নাত শ্যামবাবুর অভিনব মূর্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধানে লাল চেলি, গেরুয়া রঙের আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার সিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজিমাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপানো এবং কপালে মস্ত একটি সিন্দূরের ফোঁটা।

তিনকড়িবাবু তামাক টানার অন্তরালে বলিতেছিলেন — "দেখুন স্বামীজি, হিসেবই হল ব্যবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোনো ভয় নেই।"

শ্যামবাবু। আজ্ঞে, বড়ো যথার্থ কথা বলেছেন। সেইজন্যেই তো আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে মধ্যে এসে বিরক্ত করব, হিসেব সম্বন্ধে পরামর্শ নেব —

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। আমি সমস্ত হিসেব ঠিক করে দেব। মিটিংগুলো একটু ঘন ঘন করবেন। না হয় ডিরেক্টরস ফি বাবদ কিছু বেশি খরচ হবে। দেখুন, অডিটার-ফডিটার আমি বুঝি না। আরে বাপু, নিজের জমাখরচ যদি নিজে না বুঝলি তবে বাইরের একটা অর্বাচীন ছোকরা এসে তার কী বুঝবে? ভারী আজকাল সব বুক-কিপিং শিখেছেন! সে কী জানেন — একটা গোলকধাঁধা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি — রোজ কত টাকা এল, কত খরচ হল, আর আমার মজুত রইল কত। আমি যখন আমড়াগাছি সবডিভিজনের ট্রেজারির চার্জে, তখন এক নূতন কলেজ-পাস গোঁফকামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না, অথচ অহংকারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আস্পর্ধা। শেষে লিখলুম কোল্ডহাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দু-ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দিশি ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে আড়ালে ছোকরাকে ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন — ওয়েল তিনকড়িবাবু, তুমি হলে কতকালের সিনিয়র

অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কী বুঝবে? তারপর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা-গোলার চার্জে বদলি করে। যাক সে কথা। দেখুন, আমি বড়ো কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম বলে আমার নাম ছিল। মন্দির-টন্দির আমি বুঝি না, কিন্তু একটি আধলাও কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। রক্ত জল করা টাকা আপনার জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন —

শ্যাম। সে কী কথা! আপনার টাকা আপনারই থাকবে আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না — আমি আমার যথাসর্বস্ব পৈতৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে ফেলেছি। আমি না হয় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অর্থে প্রয়োজন নেই, লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার ফেলেছেন। গন্ডেরি এক লাখ টাকার শেয়ার নিয়েছে। সে মহা হিসেবি লোক — লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনে আশ্বাস হচ্ছে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহাম সাহেবকে কনসল্ট করলে হয় না। অমন সাহেব আর হয় না।

“ঠাঁই হয়েছে” — চাকর আসিয়া খবর দিল।

‘উঠতে আজ্ঞা হোক ব্রহ্মচারী মহাশয়, আসুন আটলবাবু, চল হে বিপিন।” তিনকড়িবাবু সকলকে অন্দরের বারান্দায় আনিলেন।

শ্যামবাবু বলিলেন — “করেছেন কী রায়সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই আপনি বসলেন না?”

তিনকড়ি। বাতে ভুগছি, ভাত খাইনে, দু-খানা সুজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম। আমি একটি ফেৎকারিণী-তন্ত্রোক্ত কবচ পাঠিয়ে দেব, ধারণ করে দেখবেন। শাক ভাজা, কড়াইয়ের ডাল — এটা কী দিয়েছে ঠাকুর, এঁচোড়ের ঘন্ট? বেশ, বেশ? শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্যঘৃত বাড়িতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে — পনসে কদলং কদলে ঘৃতম্। কদলীভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়। পুঁটি মাছ ভাজা — বাঃ। রোহিতাদপি রোচকাঃ পুন্টিকাঃ সদ্যভর্জিতাঃ। ওটা কীসের অম্বল বললেন — কামরাঙা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ওই ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি। অম্বল জিনিসটা আমার সয়ও না — শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্‌প্, উস্‌প্, উস্‌প্। প্রাণায় অপানায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে তু জনার্দন। আরম্ভ

করো হে অটল।

অটল। (জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখছি তাতে বাড়ি গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে।

তিনকড়ি। আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোনো প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা লোকের— ইয়ে — মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে?

শ্যাম। অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণবে --- অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন তো?

তিনকড়ি। হাঃ হাঃ, সে একটা তুচ্ছ কথা। কী জানেন, কোল্ডহাম সাহেব বলেছিলেন, সুবিধা পেলেই লাট সাহেবকে ধরে আমায় বড়ো খেতাব দেওয়াবেন। বারবার তো রিমাইন্ড করা ভালো দেখায় না, তাই ভাবছিলুম যদি তন্ত্রে-মন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবুও —

শ্যাম। মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত করব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এসব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে-সে হলে চলবে না। খরচ — তা আমি যথাসম্ভব অল্পেই নির্বাহ করতে পারব।

তিনকড়ি। হুঁ। দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের আপিসে তো বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা — আমার একটি শালিপো আছে, তার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারেন না? বেকার বসে বসে আমার অন্ন ধ্বংস করছে, লেখাপড়া শিখলে না, কুসঙ্গে মিশে বিগড়ে গেছে। একটা চাকরি জুটলে বড়ো ভালো হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাবচরিত্রও বড়ো ভালো।

শ্যাম। আপনার শালিপো? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিরের হেডপান্ডা করে দেব। এখনই গোটা-পনেরো দরখাস্ত এসেছে — তার মধ্যে পাঁচজন গ্র্যাজুয়েট। তা আপনার আত্মীয়ের ক্লেম সবার ওপর।

তিনকড়ি। আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়িতে একটি পুরোনো কাঁসর আছে — একটু ফেটে গেছে, কিন্তু আদত খাঁটি কাঁসা। এ জিনিসটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? সস্তায় দেব।

শ্যাম নিশ্চয় নেব। ওসব সেকেলে জিনিস কি এখন সহজে মেলে?

* * *

গন্ডেরির ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ারই বিলি হইয়া গিয়াছে। লোকে শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচা-কেনা হইতেছে।

অটলবাবু বলিলেন — "আর কেন শ্যামদা, এইবার নিজের শেয়ার সব ঝেড়ে দেওয়া যাক। গন্ডেরি তো খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দু-দিন পরে কেউ ছোঁবেও না।"

শ্যাম। বেচতে হয় বেচ, মোদ্দা কিছু তো হাতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কী করে?

অটল। ডিরেক্টরি আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামায় থাকতে চাইনে। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় আপনার তো কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

শ্যাম। এই তো সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাটবাজার সবই তো বাকি। তোমাকে কি এখন ছাড়া যায়?

অটল। থেকে আমার লাভ? পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন তো ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির মরশুম চলল। আমাদের এইখানে শেষ।

শ্যাম আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রায় কি পৃথক ফল হয়? সন্ধেবেলা যাব এখন তোমাদের বাড়িতে, — গন্ডেরিকেও নিয়ে যাব।

*　　*　　*

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী অ্যান্ড ব্রাদার-ইন-ল কোম্পানির আপিসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে। সভাপতি তিনকড়িবাবু টেবিলে ঘুসি মারিয়া বলিতেছিলেন —"আ-আ-আমি জানতে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার তো বাড়িতেই টেকা ভার, — সবাই এসে তাড়া দিচ্ছে। কয়লাওয়ালা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা, ইটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার, তারপর ছাপাখানাওয়ালা, শার্পার কোম্পানি, কুণ্ডু মুখুজ্যে, আরও কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা কী তার ঠিক নেই — এর মধ্যে দু-লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভণ্ড জোচ্চোরটা গেল কোথা? শুনতে পাই ডুব মেরে আছে, আপিসে বড়ো একটা আসে না।"

অটল। ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকছেন — এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ তো মিটিংয়ে আসবেন বলেছেন।

বিপিন বলিলেন — "ব্যস্ত হচ্ছেন কেন স্যার, এই তো ফর্দ রয়েছে, দেখুন না — জমি কেনা, শেয়ারের দালালি, preliminary expense, ইট তৈরি, establishment, বিজ্ঞাপন, আপিস খরচ —"

তিনকড়ি। চোপ রও ছোকরা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

এমন সময় শ্যামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন — "ব্যাপার কী?"

তিনকড়ি। ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিসেব চাই।

শ্যাম। বেশ তো, দেখুন না হিসেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম তদারক করে আসুন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মরি আর কি। সে হবে না — আমার টাকা ফেরত দাও। কোম্পানি তো যেতে বসেছে। শেয়ারহোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করছে।

শ্যামবাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন — "সকলই জগন্মাতার ইচ্ছা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর-এক। এতদিন তো মন্দির শেষ হওয়ারই কথা। কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব কারণে খরচ বেশি হয়ে গিয়ে টাকার অনটন হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের আর অপরাধ কী? কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর-একটা call -এর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।"

গন্ডেরি বলিলেন — "আউর টাকা কোই দিবে না, আপকো থোড়াই বিশোআস করবে।"

শ্যাম। বিশ্বাস না করে, নাচার। আমি দায়মুক্ত, মা যেমন করে পারেন নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানছেন, সেখানেই আশ্রয় নেব।

তিনকড়ি। তবে বলতে চাও, কোম্পানি ডুবল।

গন্ডেরি। বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম। আচ্ছা তিনকড়িবাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ তো, আমরা না হয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার নাম আছে, সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে, আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?

অটল। এইবার পাকা কথা বলেছেন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, আমি বদনামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম। বেগার খাটবেন কেন? আমিই এই মিটিংয়ে প্রস্তাব করছি যে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জি মহাশয়কে মাসিক ১০০০৲ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা হোক। এমন উপযুক্ত কর্মদক্ষ লোক আর কোথা? আর, আমরা যদি ভুলচুক করেই থাকি, তার দায়ী তো আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি। তা-তা — আমি চট করে কথা দিতে পারিনে। ভেবেচিন্তে দেব।

অটল। আর দ্বিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম। যদি অভয় দেন তো আর-একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেছি, অর্থ হচ্ছে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েছি, কেবল এই কোম্পানির ষোলো-শো খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সৎপাত্রে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়াম চাই না — আপনি কেনা দাম ৩২০০৲ মাত্র দিন।

তিনকড়ি। হ্যাঁ, ভালো করে আমার ঘাড় ভাঙবার মতলব।

শ্যাম। ছি ছি। আপনার ভালোই হবে। না হয় কিছু কম দিন, — চব্বিশ-শো — দু-হাজার — হাজার —

তিনকড়ি। এক কড়াও নয়।

শ্যাম। দেখুন, ব্রাহ্মণ হতে ব্রাহ্মণের দান-প্রতিগ্রহ নিষেধ, নইলে আপনার মতো লোককে আমার অমনিই দেবার কথা। আপনি যৎকিঞ্চিৎ মূল্য ধরে দিন! ধরুন — পাঁচশ টাকা। ট্রান্সফার ফর্ম আমার প্রস্তুতই আছে — নিয়ে এসো তো বিপিন।

তিনকড়ি। আমি এ—এ— আশি টাকা দিতে পারি।

শ্যাম। তথাস্তু। বড়োই লোকসান হল, কিন্তু সকলই মায়ের ইচ্ছা।

গন্ডেরি। বাহ্বা তিনকৌড়িবাবু, বহুত কিফায়ত হুয়া?

তিনকড়িবাবু পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যপ্রাপ্ত পেনশনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তর্পণে গণিয়া দিলেন। শ্যামবাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন — "তবে এখন আমি আসি। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজা আছে। আপনিই কোম্পানির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু — মা দশভুজা আপনার মঙ্গল করুন।"

শ্যামবাবু প্রস্থান করিলে তিনকড়িবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন — "লোকটা দোষে গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হামবগ, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির

ঝক্কিটা তো এখন আমার ঘাড়ে পড়ল। ক-মাস বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলুম, কিছুই দেখতে পারিনি, নইলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক, উঠে-পড়ে লাগতে হবে — আমি লেফাফা-দুরস্ত কাজ চাই, আমার কাছে কারও চালাকি চলবে না।"

গন্ডেরি। অপ্‌নের কুছ তকলিফ করতে হোবে না। কম্পানি তো ডুব গিয়া। অপ্‌কোভি ছুট্টি।

তিনকড়ি। তাহলে কী বলতে চাও আমার মাসোহারাটা —

গন্ডেরি। হাঃ, হাঃ, তুমভি রুপয়া লেওগে? কাঁহাসে মিলবে বাতলাও। তিনকৌড়িবাবু, শ্যামবাবুকা কার্‌বারই নহি সমঝা? নব্বে হাজার রুপয়া কম্প্‌নিকা দেনা। দো রোজ বাদ লিকুইডেশন। লিকুইডেটের সিকিন্ড কল আদায় করবে, তব্‌ দেনা শুধবে।

তিনকড়ি। অ্যাঁ, বল কী? আমি এক পয়সাও দিচ্ছি না।

গন্ডেরি। আলবত দিবেন। গবরমিন্ট কান পকড়কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।

তিনকড়ি। আরও টাকা যাবে। সে কত?

অটল। আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ার পিছু ফের দু-টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যামদার ১৬০০ আজ নিয়েছেন। এই ১৮০০ শেয়ারের ওপর আপনাকে ছত্রিশশো টাকা দিতে হবে। দেনা শোধ, লিকুইডেশনের খরচা — সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরত পেতে পারেন।

তিনকড়ি। তোমাদের কত গেল?

গন্ডেরি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন —"কুছ্‌ভি নহি, কুছ্‌ভি নহি! আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার তো সব শ্যামবাবু লিয়েছিল — আপ আপ্‌নেকে বিক্‌কিরি কিয়েছে।"

তিনকড়ি। চোর—চোর—চোর! আমি এখনই বিলেতে কোল্ডহাম সাহেবকে চিঠি লিখছি —

অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের তো আর শেয়ার নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চলো গন্ডেরি।

তিনকড়ি। অ্যাঁ—

গন্ডেরি। রাম রাম!

মাসি-পিসি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইট-পাটকেল ও ওজনে ভারী আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড়ো সালতি বোঝাই আঁটি বাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মস্ত গাদায়। ওঠানামা পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, রোগা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সি, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদম-ছাটা রুক্ষ চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আর-একটা সালতি, দু-হাত চওড়া হয় কি না হয়। দু-মাথায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দুজনেরই কোমরে বাঁধা! মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সি একটি বউ। গায়ে জামা আছে, নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি। আটোসাঁটো থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

"মাসি-পিসি ফিরছে কৈলেশ", বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসি-পিসির সালতি দু-হাতের মধ্যে এসে গেছে।

"ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।"

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসি-পিসি সালতির গতি ঠেকায়, আহ্লাদী সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়। সামনে থেকে পিসি বলে, "অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলেশ।"

মাসি-পিসির গলা ঝরঝরে, আওয়াজ একটু মোটা, একটু ঝংকার আছে। কৈলাশের খবরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দু-মাথায় থাকলে সম্ভব নয় চুপে চুপে। মাসি বড়ো সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন

থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আহ্লাদী যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমনি করেই বলে কৈলাশ।

"বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি", কৈলাশ শুরু করে, "মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড়ো সোমত্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষমানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো —"

মাসি বলে, "খুনসুটি রাখো দিকি কৈলেশ তোমার, মোদ্দা কথাটা কী তাই কও, বললে না যে খপর আছে কী?"

পিসি বলে, "খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলেশ।"

মাসি-পিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, "জগুর সাথে দেখা হল কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এট্টু — মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।"

মাসি বলে, "চায়ের দোকান না কীসের দোকান তা বুঝিছি কৈলেশ, তা কথাটা কী?"

পিসি বলে, "শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে বারো মাস, সেথা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কী বললে জগু?"

কৈলাশ ফাঁপরে পড়ে আড়চোখে চায় আহ্লাদীর দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গো প্রতিবাদ করে সে তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসি-পিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে গেল, "মাল খাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সে জগু নেই। বউকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এল তা মেয়া দিলে না, তাই তো নিতে আসে না আর। আমি বলি কি, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দাও মেয়াকে।"

মাসি বলে, "পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে? কলকে পোড়া ছ্যাঁকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়ি বাঁধা হয়ে থাকতে দিন ভোর রাত ভোর?"

পিসি বলে, "লাথির চোটে ফের গভ্‌ভোপাত হতে? না মরতে?"

"গভ্ভোপাত?" কৈলাশ বলে আশ্চর্য হয়ে, "ফের গভ্ভোপাত? সত্যি নাকি মাসি? এ যে প্যাঁচালো ব্যাপার হল পিসি?"

মাসি বলে, "কীসের প্যাঁচালো ব্যাপার কৈলাশ? মুয়ে নুড়ো জ্বালব তোমার ফের যদি বলবে তুমি বেয়াক্কেলে কথা। জগু আসেনি ঘনঘন ওকে নিতে? থাকেনি দু-দিন চার দিন করে।"

পিসি বলে, "মেয়া না পাঠাই জামাই এলে রাখি, জামাই আদরে থাকে? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালোমন্দ দশটা জিনিস?"

মাসি বলে, "ফের আসুক, আদরে রাখব যদ্দিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।"

পিসি বলে, "না কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।"

বুড়ো রহমান এক খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা। ছলছল চোখে একবার তাকায় আহ্লাদীর দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোটো অবুঝ মেয়ে। তার ভালোর জন্যেই তাকে জোর জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আহ্লাদীর সঙ্গে তার চেহারার কোনো মিল নাই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোটো, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আহ্লাদীর ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের ছাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আহ্লাদীর দিকে।

কৈলাশ বলে, "তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বউ নেবার জন্য। তার বিয়ে করা বউকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে, পয়সা কামাচ্ছ। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামি নিতে চাইলে বউকে আটকে রাখার নিয়ম নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজকালের মধ্যে। মরবে তোমরা জানো মাসি, জানো পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।"

আহ্লাদী একটা শব্দ করে অস্ফুট আর্তনাদের মতো। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কয়েকবার মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলল, "জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে?"

বলে মাসি বড়ো সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তরতর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারিদিকে।

শুকনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আর-একটা গাছের দিকে। ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি।

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আহ্লাদীর। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারির একটা রোগে, কলেরায়, সে তার বউ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসি-পিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেক দিন, দূর ছাই সরে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছুটা তারা রোজগার করত ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গেঁথে, শালপাতা, ফলমূল, ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা জোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দু-জোড়া থান পরন — খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দুজনের, রুপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময় বাঁচবার জন্যে তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে, আহ্লাদীর বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে কি বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে গর্ভপাতে মরমর মেয়ে এসে হাজির। সে কোন্‌দিক সামলাবে? মাসি-পিসির সেবাযত্নেই আহ্লাদী অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপ-মাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কী করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি বা সম্ভব, অন্ন দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে মাসি-পিসি আহ্লাদীর জীবনের জন্য লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে, না পেল যদি তো না খেয়েই। অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারিদিকে না খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, করণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনশক্তি, একদিন মাসি বলে পিসিকে, "একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতে তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।"

শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। এটা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া- আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল। এতে

কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে। আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারও সাথে হয়তো মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্থের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসি-পিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্যে বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসি-পিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখদুঃখের কথা তারা কাকেই বা বলবে, কেই বা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসি এ বাড়ির মেয়ে, এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির ওপর পিসির একটা অবজ্ঞা-অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্তি দুঃখী মানুষ মনে হত এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হত তাদের দেখে। সে কী রাগ, সে কী তেজ, সে কী গোঁ! মনে হত এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বাঁটি দিয়ে।

শাকসবজি বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গো কোমর বেঁধে নেমে পড়ামাত্র সব বিরোধ, সব পার্থক্য উড়ে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আহ্লাদীর ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের নিজের পেট ভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আহ্লাদী আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।

বাপ-মা বেঁচে থাকলে আহ্লাদীকে হয়তো শ্বশুরবাড়ি যেতে হত, মাসি-পিসিও বিশেষ কিছু বলত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসি-পিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়েছিল, আহ্লাদীকে পাঠানো হবে না। আহ্লাদীকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেদের কাছে কখনও মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাওয়ার কথা ভাবলেই মেয়ে তখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়।

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আহ্লাদীতে বর্তেছে, জগুর বউ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে

গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আহ্লাদীকে রেখে কোথাও যাওয়ার সাহস তাদের হয় না। দুজনে মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আহ্লাদীকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, "ডরাসনি আহ্লাদী। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয়তো কৈলাশকে দিয়ে ওসব কথা বলায় মোদের?"

পিসি বলে, "দু-দিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধালে বলবে, কই না, আমি তো ওসব কিছু বলিনি কৈলাশকে।"

মাসি বলে, "চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা। মা-মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা, জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।" পিসি বলে, "ছেলের মুখ দেখে পাষাণ নরম হয় জানিস আহ্লাদী। তোর পিসে ছিল জগুর মতো, মাল টানত আর মোকে মারত। খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপি চুপি এসে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে, বসতে বলি তো বসে, রাত দুপুরে চুর হয়ে এসে হাতে পায়ে ধরে বলে, একবারটি খোকাকে কোলে দে পদী — খোকা যেতে পাগলের মতো দিবারাত্তির মাল খেয়ে নিজেও গেল।"

মাসি বলে, "তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি ননদ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কী ছ্যাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আহ্লাদী, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ি ননদ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।"

পিসি বলে, "তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ডরাস্‌নি, ভয় কীসের?"

বাড়ি ফিরে দীপ জেলে মাসি-পিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আহ্লাদীর পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কাটছে। তবু মাসি-পিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তাঁর ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে। মাসি-পিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কীভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে। কতজন কতভাবে মাসি-পিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কি না যাচাই করার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কতরকমের দর দিয়েছে মাসি-পিসির কাছে। মাসি-পিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসি-পিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়া তার এই মাসি-পিসি, কী দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসি-পিসিকে এত যন্ত্রণা দেওয়ার চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সইত, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ

তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আহ্লাদী। এক পাশে মাসি আর এক পাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন?

রান্না সেরে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসি-পিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আহ্লাদীকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সড়গড় হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে একথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আহ্লাদীর কথা, আহ্লাদীর সুখদুঃখ, আহ্লাদীর সমস্যা, আহ্লাদীর ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষমানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত নয়, এসব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এই ভাব দেখাবে মাসি-পিসি — আহ্লাদীকে শিখিয়ে দিতে হবে সোয়ামি এসেছে বলে যেন আহ্লাদের গদগদ হওয়ার ভাব দেখায়। যে ক-দিন থাকে জামাই, সে যেন অনুভব করে, সেই এখানকার কর্তা, সেই সর্বেসর্বা।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসি-পিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকারবাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দুজনের। এখন এল চৌকিদার কানাই। হাঙ্গামা না আসে রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসি-পিসি বাইরে যায়। শুক্লপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাইয়ের সঙ্গে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসি-পিসি চিনতে পারে, মাথার লাল পাগড়ি আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।

কানাই বলে, "কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।"

মসি বলে, "এত রাতে?"

পিসি বলে, "মরণ নেই?"

কানাই বলে, "দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবে গো দিদিঠাকরুণরা। বেঁধে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আছে।"

মাসি-পিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসি-পিসি। ওরা যে গাঁয়ের

গুন্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটিবাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনেস্টবলের সঙ্গে। ওরা এসে আহ্লাদীকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, "মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?"

পিসি বলে, "আমি যাই চল?"

কর্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসি-পিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, "কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।"

পিসি বলে "সকড়ি হাত ধুয়ে আসি, একদণ্ড লাগবে না।"

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বঁটিটা হাতে করে, পিসিমার হাতে দেখা যায় রামদার মতো মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, "কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে লজ্জা করে। কাল সকালে যাবো।"

পিসি বলে, "এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার লজ্জা করে না কানাই।"

কানাই ফুঁসে ওঠে, "না যদি যাও ঠাকরুণরা ভালোয় ভালোয়, ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।"

মাসি বঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, "বটে? ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।"

পিসি বলে, "আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার।"

দু-পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসি-পিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যিই তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বঁটি আর দা উঁচু হয় মাসি-পিসির।

মাসি বলে, "শোন কানাই, এ কিন্তু এর্কি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েলোক পারব না জনি, কিন্তু দুটো-একটাকে মারব, জখম করব ঠিক।"

পিসি বলে, "মোরা নয় মরব।"

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসি-পিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথম শুরু করে

মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশেপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, "ও বাবাঠাকুর। ও ঘোষ মশায়! ও জনাদ্দন! ওগো কানুর মা, বিপিন, বংশী ..."

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হট্টগোলের পর আরও নিঝুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আহ্লাদীকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসি-পিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসি-পিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেওয়ার জন্যে, এতলোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হল সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসি-পিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, "জানো বেয়ান, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি।"

পিসি বলে, "তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।"

খানিক চুপচাপ ভাবে দুজনে।

মাসি বলে, "সজাগ রইতে হবে রাতটা।"

পিসি বলে, "তাই ভালো। কাঁথা কম্বলটা চুবিয়ে রাখি জলে, কী জানি কী হয়।"

আস্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, যেন আহ্লাদীর ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদীর বাপের আমলের গোরুটা নেই, গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরোনো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলশিতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি।

অযান্ত্রিক

সুবোধ ঘোষ

বিমলের একগুঁয়েমি যেমন অব্যয়, তেমনি অক্ষয় তার ওই ট্যাক্সিটার পরমায়ু। সাবেক আমলের একটা ফোর্ড — প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্বাঙ্গে একটা কদর্য দীনতার ছাপ। যে নেহাত দায়ে পড়েছে বা জীবনে দেখেনি, সে ছাড়া আর কেউ ভুলেও বিমলের ট্যাক্সির ছায়া মাড়ায় না। দেখতে যদিও জবুথবু কিন্তু কাজের বেলায় বড়োই অদ্ভুতকর্মা বিমলের এই ট্যাক্সি। বড়ো বড়ো চাঁইগাড়ির পক্ষে যাহা অসাধ্য, তা ওর কাছে অবলীলা। এই দুর্গম অভ্রখানি অঞ্চলের ভাঙাচোরা ভয়াবহ জংলি পথে — ঘোর বর্ষার রাত্রে — যখনই ভাড়া নিয়ে ছুটতে সব গাড়িই নারাজ, তখন সেখানে অকুতোভয়ে এগিয়ে যেতে পারে শুধু বিমলের এই পরম প্রবীণ ট্যাক্সিটি। তাই সবাই যখন জবাব দিয়ে সরে পড়ে একমাত্র তখনই শুধু গরজের খাতিরে আসে তার ডাক, তার আগে নয়।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে সারি সারি জমকালো তরুণ নিউ মডেলের মধ্যে বিমলের বুড়ো ফোর্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়, জটায়ুর মতো তার জরাভার নিয়ে। বাস্তবিক বড়ো দৃষ্টিকটু। তালিমারা হুড, সামনের আর্শিটা ভাঙা, তোবড়ানো বনেট, কালিঝুলি মাখা পর্দা আর চারটে চাকার টায়ার পটি লাগানো; সে এক অপূর্বশ্রী। পাদানিতে পা দিলে মাড়ানো কুকুরের মতো কঁ্যাচ করে আর্তনাদ করে ওঠে। মোটা তেলের ছাপ লেগে সিটগুলি এত কলঙ্কিত যে, সুবেশ কোনো ভদ্রলোককে পায়ে ধরে সাধলেও তাতে বসতে রাজি হবে না। দরজাগুলো বন্ধ করতে বেশ বেগ পেতে হয়, আর যদিও বন্ধ হল তো তাকে খোলা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। সিটের ওপর বসলেই উপবেশকের মাথায় আর মুখে এসে লাগবে ওপরের দড়িতে ঝোলানো বিমলের গামছা, নোংরা গোটা দুই গেঞ্জি আর তেলচিটে আলোয়ান।

বিমলের গাড়ির দূরায়ত ভৈরব হর্ষ শোনামাত্র প্রত্যেকটি রিকশা সভয়ে রাস্তার শেষ কিনারায় সরে যায় — অতি দুঃসাহসী সাইকেল-ওয়ালারও বিমলের ধাবমান

গাড়ির পাশ কাটিয়ে যেতে বুক কাঁপে। রাত্রির অন্ধকারে একবার দেখা যায়, দূর থেকে যেন একটা একচক্ষু দানব অট্টশব্দে হা হা করে তেড়ে আসছে; বুঝতে হবে ওইটি বিমলের গাড়ি। হেড লাইটের আলো নির্বাণপ্রাপ্ত, আলগা আলগা শরীরের গাঁটগুলো যে-কোনো সময়ে বিস্ফোরকের মতো শতধা হয়ে ছিটকে পড়তে পারে।

সবচেয়ে বেশি ধুলো ওড়াবে, পথের মোষ খ্যাপাবে আর কানফাটা আওয়াজ করবে বিমলের গাড়ি। তবু কিছু বলবার জো নেই বিমলকে। চটাং চটাং মুখের ওপর দু-কথা উলটে শুনিয়ে দেবে — মশাই বুঝি কোনো নোংরা কম্ম করেন না, চেঁচান না, দৌড়ান না? যত দোষ করেছে বুঝি আমার গাড়িটা!

কত রকমই না বিদ্রুপ আর বিশেষণ পেয়েছে এই গাড়িটা — বুড়ঢা ঘোড়া, খোঁড়া হাঁস, কানা ভঁইস! কিন্তু বিমলের কাছ থেকে একটা আদুরে নাম পেয়েছে এই গাড়ি — জগদ্দল। এই নামেই বিমল তাকে ডাকে, আর ব্যস্ত-ত্রস্ত কর্মজীবনে সুদীর্ঘ পনেরোটি বছরের সাথি এই যন্ত্রপশুটা; সেবক, বন্ধু আর অন্নদাতা।

সন্দেহ হতে পারে, বিমল তো ডাকে, কিন্তু সাড়া পায় কি? এই অন্যের পক্ষে বোঝা কঠিন। কিন্তু বিমল জগদ্দলের প্রতিটি সাধ-আহ্লাদ, অভিমান এক পলকে বুঝে নিতে পারে।

"ভারী তেষ্টা পেয়েছে, না রে জগদ্দল? তাই হাঁসফাঁস কচ্ছিস? দাঁড়া বাবা দাঁড়া।" জগদ্দলকে রাস্তার পাশে একটা বড়ো বটগাছের ছায়ায় থামিয়ে বিমল কুয়ো থেকে বালতি ভরে ঠান্ডা জল আনে, রেডিয়েটরের মুখে ঢেলে দেয় বিমল। বগ-বগ করে চার-পাঁচ বালতি জল খেয়ে জগদ্দল শান্ত হয়, আবার চলতে থাকে।

এ ট্যাক্সির মালিক ও চালক বিমল স্বয়ং। আজ নয়, একটানা পনেরো বছর ধরে।

স্ট্যান্ডের এক কোণে তার সব দৈন্য আর জরাভার নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো জগদ্দল। পাশে হাল-মডেলের গাড়িটার সুমসৃণ ছাইরঙা বনেটের ওপর গা এলিয়ে বসে পিয়ারা সিং বিমলকে টিটকারি দিয়ে কথা বলে — "আর কেন, এ বিমলবাবু? এবার তোমার বুড়িকে পেনশন দাও?'

'হুঁ, তারপর তোমার মতো একটা চটকদার হাল-মডেল বেশ্যা রাখি।' বিমল সটান উত্তর দেয়। পিয়ারা সিং আর কিছু বলাবাহুল্য মনে করে না; কারণ বললেই বিমল রেগে যাবে, আর তার রাগ বড়ো বুনো ধরনের।

কার্তিক পূর্ণিমায় একটা মেলা বসবে এখান থেকে মাইল বারো দূরে, সেখানে

আছে নরসিংহ দেবের বিগ্রহ নিয়ে এক মন্দির। ট্যাক্সি স্টান্ডে যাত্রীর ভিড়। চটপট ট্যাক্সিগুলো যাত্রী ভরে নিয়ে হুস হুস করে বেরিয়ে গেল। শূন্য স্ট্যান্ডে একা পড়ে থেকে শুধু ধুঁকতে লাগল বুড়ো জগদ্দল। কে আসবে তার কাছে — যার ওই প্রাগৈতিহাসিক গঠন আর পৌরাণিক সাজসজ্জা।

গোবিন্দ এসে সমবেদনা জানিয়ে বলল — কি গো বিমলবাবু, একটাও ভাড়া পেলে না?

— না।

— তবে?

— তবে আর কী? এর শোধ তুলব সন্ধেয়। ডাবল ওভারলোড নেব, যা থাকে কপালে।

— ও করে আর ক-দিন কারবার চলবে? বরং এইবার আর দেরি না করে জগদ্দলকে এক্সচেঞ্জে দিয়ে ঝরিয়া থেকে আনিয়ে নাও মগনলালের গাড়িটা। তোফা ছ-সিলিন্ডার সিডান, সত্যি।

— আরে যেতে দাও, কে অত ঝঞ্ঝাট করে বল?

— এটা হল ঝঞ্ঝাট? আর নিত্যি এই লুকিয়ে পাকিয়ে ওভারলোড নেওয়ার হয়রানি সেটা ঝঞ্ঝাট নয়?

— না ভাই যেতে দাও ওসব কথা। নাও, বিড়ি খাও।

গোবিন্দ চুপ করে গেল। জগদ্দলের প্রসঙ্গ পরের মুখে আলোচনা বিমল কোনোদিনই বরদাস্ত করে না। চেপে যাওয়াই ভালো, নইলে এখনই হয়তো একটা পপভাষা ব্যবহার করে বসবে।

বাজে কথায় মন না দিয়ে বিমলও ক্যানেস্তারা ভরে জল নিয়ে এল — পিচকারি দিয়ে বুড়ো জগদ্দলের ধুলোকাদা ধুতে লেগে গেল। হামা দিয়ে গাড়িটার তলায় ঢুকে চিত হয়ে শুয়ে পিচকারির জল ছড়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, টাইরডের গলায় গোবরের দাগটা গেল কি না? ডিফারেনসিয়ালের বত্তুল পেটটা ন্যাতা দিয়ে ঘষে ঘষে চকচকে করে ফেলে। আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে — আঃ, হুডটা বেজায় পুরোনো, দু-জায়গায় ফেটে মস্ত বড়ো দুটো ফাঁক হাঁ করে আছে।

— কী করব জগদ্দল। এবার তালি নিয়েই কাজ চালা। আসছে পুজোয় ক-টা ভালো রিজার্ভ পেলে তোকে নতুন রেক্সিনের হুড পরাবো, নিশ্চয়।

জগদ্দলের প্রসাধন এখানেই ক্ষান্ত হয় না। পকেট হাতড়ে বিমল শেষ দুয়ানিটা বার করে — কেরোসিন তেল কিনে এনে বোল্টগুলোর মরচে মুছতে লেগে যায়।

গৌর এসে বলল — 'এ্যাঁ, এ কী হচ্ছে বিমলবাবু, ভাঙা মন্দিরে চুনকাম!'

বিমল বিশ্রীভাবে মুখ বিকৃত করে খেঁকিয়ে উঠল — সোজা কেটে পড় না রাজা এখান থেকে, কে তোমায় বকবক করতে ডেকেছে?

বিমল এইটেই বুঝে উঠতে পারে না যে, তার এইসব প্রাইভেট ব্যাপারে অপরে এত মাথা ঘামাতে আসে কেন?

'প্রাইভেট' — পিয়ারা সিং হেসে যেন গড়িয়ে পড়ে। — "গাড়ভি ঘরকা আওরাত হ্যায় ক্যা?"

কারবার ডুবতে বসেছে, তবুও বিমলের ওই এক রোখ। এই কুদৃশ্য বুড়ো গাড়িটার ওপর একটা উৎকট মায়া তার কারবারি বুদ্ধিকেও দিয়েছে ঘুলিয়ে। তা না হলে এতবড়ো মক্ষিচোষক কৃপণ বিমল — যে ধানবাদে পুরির দাম বেশি বলে দিনটা উপোসে কাটিয়ে পরদিন গয়ায় ফিরে সস্তাদরে দুগুণ খাওয়া খায়। সেই বিমল অকুণ্ঠ হাতে এই গাড়ির পিছনে খরচ করে চলেছে, ভস্মে ঘি ঢালছে।

বুলকি পাগলারও এমনি ধরনের স্নেহান্ধতা ছিল তার একটা ভাঙা টিনের গামলার ওপর। নিজে বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজত, কিন্তু ছাতা দিয়ে সযত্নে ঢেকে রাখত তার ভাঙা গামলাটিকে।

সন্ধের আবছা অন্ধকার নেমে এল, দোকানগুলোতে দু-একটা পেট্রোম্যাক্স বাতি উঠল জ্বলে। ময়রার দোকানের উনুন থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারটা আরও পাকিয়ে তুলল।

অদূরে ট্রফিক পুলিশটাকেও একটু আনমনা দেখাচ্ছে। পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে একদল চাষি গেরস্থ আসছে এইদিকে — দূর দেহাতের যাত্রীসব। এই তো শুভ লগ্ন।

বিমল হাঁকল, গলা নয়তো চোঙবিশেষ — চলা আও, চলা আও। রামগড়, রাঁচি, নয়াসরাই। মজুদগঞ্জ, চিত্রপুর, ঝালদা। কনসেশন রেট — কনসেশন।

আগন্তুক যাত্রীদলের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছাল এ ডাক। কনসেশন রেট — কিন্তু সংখ্যায় চোদ্দোজন। বুড়ো জগদ্দলের উদর গহ্বরে ছ-জনের স্থানে ঠেসে দিলে চোদ্দোজনকে। হুবহু ক্যাঙারুর পেটে, কার সাধ্য বোঝে বাইরে থেকে ক-টি জীব সেখানে প্রচ্ছন্ন। ক্ষিপ্র হাতে ঘুরিয়ে দিল স্টার্টিং হ্যান্ডেল — মাত্র দু-তিন পাক। মত্ত সিংহের মতো বুড়ো জগদ্দল গর্জে উঠল — পানের দোকানে লাল জলের

বোতলগুলো কেঁপে উঠল ঠুং ঠুং করে। হর্নের বিলাপে বাজার মাত করে একটুকরো কালবোশেখির মতো জগদ্দল স্ট্যান্ড ছেড়ে ডাইনের সড়ক ধরে উধাও হয়ে গেল।

হ্যাঁ, একখানা গাড়ি গেল বটে — পানওয়ালা বলল — "আজব এক চিজ হ্যায় বিমলবাবুকা ট্যাক্সি।"

এই হল বিমলের নিত্যদিনের সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি।

জগদ্দলের বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়াটা ষড়যন্ত্র করছে। এই রকম একটা সংশয় বিমলের মনে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। দেখে আর আশ্চর্য হয় — উড়ন্ত চিলগুলোও বেছে ঠিক 'জগদ্দলের' মাথার ওপর মলত্যাগ করে। পথচারী লোকেরা পান খেয়ে হাতের চুনটি নিঃসংকোচে জগদ্দলের গায়েই মুছে দিয়ে সরে পড়ে। স্ট্যান্ডের আরও তো ভালোমন্দ সাতাশটা গাড়ি রয়েছে; তাদের তো কেউ এতটা অশ্রদ্ধা করতে সাহস করে না। জগদ্দলই বা কার পাকা ধানে এমন মই দিল?

জগদ্দল! বিমল আস্তে আস্তে ডাকে। স্নেহে দ্রব হয়ে আসে তার কণ্ঠস্বর। তার সকল মমতা রক্ষাকবচের মতো জগদ্দলকে যেন এই সমবেত অভিশাপ আর নিত্য গঞ্জনা থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।

— "কুছ পরোয়া নেই জগদ্দল। আমি আর তুই আছি।" — একটা সুদর্পিত চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বিমল বেপরোয়াভাবে, বিড়িতে জোরে জোরে টান দিয়ে যেন প্রতিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়।

ঝড়-ঝঞ্ঝা নিয়ে এক-আধটা দুর্দিনও আসে, আকস্মিক আধিব্যাধি মেরামতও থাকে — তাই প্রত্যেক গাড়িই এক-আধবার কামাই দিতে বাধ্য। কিন্তু জগদ্দলের উপস্থিতি ছিল সূর্যোদয়ের চেয়েও নিয়মিত ও নিশ্চিত। সমব্যবসায়ী ট্যাক্সিচালক মহলে এও একটা ঈর্ষার কারণ হতে পারে। অন্ততপক্ষে বিমলের তাই বিশ্বাস। একটা খুনখুনে বুড়ো যদি দিনের পর দিন অনায়াসে লাফ-ঝাপ ডনকুস্তি মেরে বেড়ায়, কোন্ জোয়ান না তাকে হিংসা করে?

জগদ্দলকে নিয়ে এই অহেতুক গর্বে বিমল ফুলে থাকত সর্বদা। জগদ্দল — তার গত পনেরো বছরের বিলাসে ব্যসনে দুর্দিনে নিত্য-সহচর। একাগ্র সেবায় তাকে পরিপুষ্ট করে এসেছে। দেব নরসিংহের কাছে কত লোক কত বিচিত্র মানত করে — কত রূপং দেহি যশো দেহি। বিমল দু-পয়সার ফুল বাতাসা-নরসিংহের পায়ের কাছে রাখে, মনে মনে ধ্বনিত হয় — একান্ত প্রার্থনা, সামান্য একটু দাবি। "হে বাবা,

জগদ্দল যেন বিকল না হয়। এ-বয়সে আর আমায় সঙ্গীহীন করো না বাবা, দোহাই।"

"লোকটাও একটা যন্ত্র" — বেঙ্গালি ক্লাবে আলোচনা হয়। — "নইলে পনেরো বছর ধরে অহর্নিশি মোটরধ্যান। এ মানুষের সাধ্য নয়।"

বিমল নিজেই বলে, পোড়া পেট্রোলের গন্ধে ওর কেমন বেশ একটু মিঠে মিঠে নেশা লাগে।

"আমিও যন্ত্র। বেঙ্গালি ক্লাব বলেছে ভালো।" বিমল খুশি হয়ে মনে মনে হাসে। কিন্তু জগদ্দলও যে মানুষের মতো, এ তত্ত্ব বেঙ্গালি ক্লাব বোঝে না, এইটেই যা দুঃখ। এই কম্পিটিশনের বাজারে এই বুড়ো জগদ্দলই তো দিন গেলে নিদেন দুটি টাকা তার হাতে তুলে দিচ্ছে। আর তেল খায় কত কম। গ্যালনে সোজা বাইশটি মাইল দৌড়ে যায়। বিমল গরিব — জগদ্দল যেন এটুকু বোঝে।

আরবি ঘোড়ার মতো প্রমত্ত বেগে জগদ্দল ছুটে চলেছে রাঁচির পথে। সাবাস তার দম, দৌড় আর লোড টানার শক্তি। কম্পমান স্টিয়ারিং হুইলটাকে দু-হাতে আঁকড়ে বুক ঠেকিয়ে বিমল ধরে রয়েছে। অনুভব করছে দুঃশীল জগদ্দলের প্রাণস্ফূর্তির শিহরন। কনকনে মাঘী হাওয়া ইস্পাতের ফলার মতো চামড়া চেঁছে চলে যাচ্ছে। মাথায় জড়ানো কমফোর্টার দু-কানের ওপর টেনে নামিয়ে দিল — বিমলের বয়স হয়েছে, আজকাল ঠান্ডাফান্ডা সহজে কাবু করে দেয়।

সুমুখে পড়ল একটা পাহাড়ি ঘাট — এই সুবিসর্পিত চড়াইটা জগদ্দল রুষ্ট চিতাবাঘের মতো একদমে গোঁ গোঁ করে কতবার পার হয়ে গেছে। সেদিনও অভ্যস্ত বিশ্বাসের ঘাটের কাছে এসে বিমল চাপল এক্সিলেটার — পুরো চাপ। জগদ্দল পঞ্চাশ গজ এগিয়ে খং খং করে কোঁকিয়ে উঠল। যেন তার বুকের ভিতর ক-টা হাড় সরে গিয়েছে, উৎকর্ণ হয়ে বিমল শুনল সে আওয়াজ। না ভুল নয়, সেরেছে আজ জগদ্দল — পিস্টন ভেঙে গেছে।

ক-দিন পরে মাঝপথে এমনই আকস্মিকভাবে বেয়ারিং গলে গিয়ে একটা বড়ো রিজার্ভ নষ্ট হয়ে গেল। তারপর একটা না একটা উপসর্গ লেগেই রইল। এটা দূর হয় তো ওটা আসে। আজ ফ্যানবেল্ট ছেঁড়ে, কাল কারবুরেটারে তেল পার হয় না, পরশু প্লাগগুলো অচল হয়ে পড়ে — শট সারকিট হয়।

এত বড়ো বিশ্বাসের পাহাড়টা শেষে বুঝি টলে উঠল। বিমল ক-দিন থেকে

অস্বাভাবিক রকমের বিমর্ষ — এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে বেড়ায়। জগদ্দলেরও নিয়মভঙ্গ হয়েছে — স্ট্যান্ডে আসা বাদ পড়ছে মাঝে মাঝে। উৎকণ্ঠায় বিমলের বুক দুরদুর করে। তবে কি শেষে সত্যই জগদ্দল ছুটি নেবে?

"— না।" আমি আছি জগদ্দল, তোকে সারিয়ে টেনে তুলবই, ভয় নেই। মোটরবিশারদ পাকা মিস্ত্রি বিমল প্রতিজ্ঞা করল।

কলকাতায় অর্ডার দিয়ে আনাল প্রত্যেকটি জেনুইন কলকবজা। নতুন ব্যাটারি, ডিস্ট্রিবিউটার, এক্সেল, পিস্টন — সব আনিয়ে ফেলল। অকৃপণ হাতে শুরু হল খরচ; প্রয়োজন বুঝলে রাতারাতি তার করে জিনিস আনায়। রাত জেগে খুটখাট মেরামত, পার্টস বদল আর তেলজল চলেছে। জগদ্দলকে রোগে ধরেছে — বিমল প্রায় খেপে উঠল। অর্থাভাব — বেচে ফেলল ঘড়ি, বাসনপত্র, তক্তপোষটা পর্যন্ত।

সর্বস্ব তো গেল, যাক পনেরো বছরের বন্ধু জগদ্দল এবার খুশি হবে, সেরে উঠবে। খুব করা গেছে যা হোক, এবার নতুন হুড, রং আর বার্নিশ পড়লে একখানি বাহার খুলবে বটে।

রাতদুপুরে জগদ্দলকে গ্যারেজে বন্ধ করার সময় বিমল একবার আলো তুলে দেখে নিল। খুশি উপচে পড়ল তার দু-চোখে। — এই তো বলিহারি মানিয়েছে জগদ্দলকে।

ক-দিনের অক্লান্ত সেবায় জগদ্দলের চেহারা গেছে ফিরে; দেখাচ্ছে যেন একটা তেজি পেশিওয়ালা পালোয়ান — এক ইশারায় দঙ্গালে ভিড়ে যেতে প্রস্তুত। হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ল বিমল — বড়ো পরিশ্রমের চোট গেছে ক-দিন। কিন্তু কী আরামই না লাগছে ভাবতে — জগদ্দল সেরে উঠেছে; কাল সকালে সগর্জনে নতুন হর্নের শব্দে সচকিত করে জগদ্দলকে নিয়ে যখন স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াবে, বিস্ময়ে হতবাক হবে সব আবার জ্বলবে হিংসেতে।

হঠাৎ বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। শেষ রাত্রি, তবু নিরেট অন্ধকার। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ধড়ফড় করে উঠে বসল বিমল। — জগদ্দল ভিজছে না তো! গ্যারেজের টিনের ছাদটা যা পুরোনো, কত ফুটো ফাটাল আছে কে জানে। কোনো ফাঁকে ইঞ্জিনে জল ঢুকলে হয়েছে আর কি! বডির নতুন পালিশটাকেও স্রেফ ঘা করে দেবে।

হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়ে গ্যারেজে ঢুকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল — "আরে হায়! হায়! ছাদের ফুটো দিয়ে ঝপ্ ঝপ্ করে বৃষ্টির জল ঝরে পড়েছে ঠিক ইঞ্জিনের ওপর।

দৌড়ে শোওয়ার ঘর থেকে নিয়ে এল তার বর্ষাতিটা, টেনে আনল বিছানার কম্বল, শতরঞ্চি চাদর।

ইঞ্জিনের ভেজা বনেটটা মুছে ফেলে কম্বলটা চাপিয়ে দিল — তার ওপর বর্ষাতিটা। শতরঞ্চি আর চাদর দিয়ে গাড়িটার সর্বাঙ্গ ঢেকে দিয়ে নিজেও ঢুকে শুয়ে পড়ল ভিতরে; নতুন নরম গদিটার ওপর গুটিসুটি মেরে বিমল শুয়ে পড়ল। আরামে তার দু-চোখে ঘুমের ঢল এল নেমে।

পরদিনের ইতিহাস। স্ট্যান্ডের উদ্‌গ্রীব জনতা জগদ্দলকে ঘিরে দাঁড়াল — যেন একটা অঘটন ঘটে গেছে। স্তুতিমুখর দর্শকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল বিমলের অপূর্ব মিস্ত্রি-প্রতিভার নিদর্শন। বিমল টেনে টেনে কয়েকবার হাসল। কিন্তু কেমন যেন একটু অস্বচ্ছ সে হাসি, একটা শঙ্কার ধূসর স্পর্শে আবিল।

কেন ? বিমলের মন গেছে ভেঙে। জগদ্দল চলছে সত্যি, কিন্তু কই সেই স্টার্ট মাত্র শক্তির উচ্চকিত ফুকার, সেই দর্পিত হ্রেষাধ্বনি আর দুরন্ত বনহরিণের গতি ?

শহর থেকে দূরে একটা মাঠের ধারে গিয়ে বিমল বেশ করে জগদ্দলকে পরীক্ষা করে দেখল।

—"চল বাবা জগদ্দল ! একবার পক্ষীরাজের মতো ছাড় তো পাখা।" চাপল এক্সিলেটার। নাঃ বৃথা, জগদ্দল অসমর্থ।

ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড — প্রত্যেকটি গিয়ার পরপর পালটে টান দিল। শেষে রাগ চড়ে গেল মাথায় — চল্ নইলে মারব লাথি।

অক্ষম বৃদ্ধের মতো জগদ্দল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে খানিক দূর দৌড়ল।

— "আদর বোঝে না, কথা বোঝে না শালা লোহার বাচ্চা, নির্জীব ভূত" — বিমল সত্যি সত্যি ক্লাচের ওপর সজোরে দুটো লাথি মেরে বসল।

বিমলের রাগ ক্রমশ বাড়ছে, সেই বুনো রাগ। আজ শেষ জবাব জেনে নেবে সে। জগদ্দল থাকতে চায়, না যেতে চায় ? অনেক তোয়াজ করেছে সে, আর নয়।

রাগে মাথাটা খারাপই হয়ে গেল বোধ হয়। বিমল ঠেলে ঠেলে প্রকাণ্ড সাত-আটটা পাথর নিয়ে এল। ঘামে ভিজে ঢোল হয়ে গেল তার খাকি কামিজ। এক এক করে সব পাথরগুলো গাড়িতে দিল তুলে — একেই বলে লোভ।

চল্। জগদ্দল চলল; গাঁটে গাঁটে আর্তনাদ বেজে উঠল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। অসমর্থ — আর পারবে না জগদ্দল এ ভার বইতে।

এইবার বিমল নিশ্চিন্ত। জগদ্দলকে যমে ধরেছে — এ সত্যে আর সন্দেহ নেই। এত কড়া কলজে জগদ্দলের ঘুণ ধরল আজ। কৃতান্তের কীট — আর রক্ষে নেই, এইবার দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামবে। শেষ কড়ি খরচ করেও রইল না জগদ্দল।

আমি শুধু রৈনু বাকি — পরিশ্রান্ত বিমল মনে মনে যেন বলে উঠল — কিন্তু আমারও তো হয়ে এসেছে। চুলে পাক ধরেছে; রগগুলো জোঁকের মতো গা ছেড়ে ফেলেছে সব।

— জগদ্দল আগেই যাবে মনে হচ্ছে। তারপর আমার পালা। যা জগদ্দল, ভালো মনেই বিদেয় দিলাম। অনেক খাইয়েছিস, পরিয়েছিস, আর কত পারবি? আমার যা হওয়ার হবে। — যা কোনো দিন হয়নি তা হল। ইস্পাতের গুলির মতোই শুকনো ঠাণ্ডা বিমলের চোখে দেখা দিল দু-ফোঁটা জল।

ফিরে এসে বিমল জগদ্দলকে গ্যারেজের বাইরে বেলতলায় দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল। পেছন ফিরে আর তাকাল না। সোজা গিয়ে উঠোনে বসে পড়ল — সামনে রাখল দু-বোতল তেজালো মহুয়া।

একটি চুমুক সবে দিয়েছে, শোনা গেল কে ডাকছে — বিমলবাবু আছে। গোবিন্দের গলা।

— আদাব বাবুজি।

— আদাব, কোন্ গাড়ির এজেন্ট আপনি? বিমল প্রশ্ন করল। গোবিন্দ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল — "গাড়ির এজেন্ট নন উনি; পুরোনো লোহা কিনতে এসেছেন কলকাতা থেকে। তোমার তো গাদাখানেক ভাঙা এক্সেল রিমটিম জমে আছে। দর বুঝে ছেড়ে দাও এবার।"

বিমল খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। ভবিতব্যের ছায়ামূর্তি তার পরম ক্ষুধার দাবি নিয়ে, ভিক্ষাভাণ্ডটি প্রসারিত করে আজ দাঁড়িয়েছে সম্মুখে। এমনিতে ফিরবে না সে, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা চাই; বিমল ব্যাপারটা বুঝল।

— হ্যাঁ আছে পুরোনো লোহা, অনেক আছে, কত দর দিচ্ছেন?

— চোদ্দো আনা মন বাবুজি, মাড়োয়ারির ব্যগ্র জবাব এল। — লড়াই লেগেছে, এই তো মওকা; ঝেড়ে পুছে সব দিয়ে ফেলুন বাবুজি।

— হ্যাঁ সব দেব। আমার ওই গাড়িটাও। ওটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে। হতভম্ব গোবিন্দ শুধু বলল — সে কি গো বিমলবাবু?

নেশা ভাঙল এক ঘুমের পর। তখনও রাত, বিমল আর -এক বোতল পান করে শুয়ে পড়ল।

ভোর হয়ে এসেছে। থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বিমলের। বাইরের জাগ্রত পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল উপচে একটি শুধু শব্দ বিমলের কানে এসে আছড়ে পড়ছে — ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং। মাড়োয়ারির লোকজন ভোরে এসেই বিমলের গাড়ি টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলেছে।

শোক আর নেশা। জগদ্দলের পাঁজর খুলে পড়ছে একে একে। বিমলের চৈতন্যও থেকে থেকে কোনো অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের আবর্তে যেন পাক দিয়ে নেমে যাচ্ছে অতলে। তার পরেই লঘুভার হয়ে ভেসে উঠছে ওপরে। এরই মাঝে শুনতে পাচ্ছে — ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং — জগদ্দলের সমাধি খনন চলেছে। যেন কোদাল আর শাবলের শব্দ।

বিষফুল

সত্যজিৎ রায়

।।১।।

"ওদিকে যাবেন না বাবু!"

জগন্ময়বাবু চমকে উঠলেন। কাছাকাছির মধ্যে যে আর কোনো লোক আছে সেটা উনি টের পাননি; তার ফলেই এই চমকানি। এবার দেখলেন তাঁর ডাইনে হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটি তেরো-চোদ্দো বছরের ছেলে, তার পরনে একটা ডোরা কাটা নীল হাফপ্যান্ট, আর গায়ে জড়ানো একটা সবুজ রঙের দোলাই। ছেলেটির রং কালো, মাথার চুল গ্রাম্য কায়দায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো, চোখ দুটিতে শান্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। গ্রাম্য হলেও নির্ঘাত ইস্কুলে পড়ে। আকাট মূর্খ হলে চোখে অমন চাহনি হয় না।

"কোন্‌দিকে যাব না?" জগন্ময়বাবু প্রশ্ন করলেন।

"ওই দিকে।"

অর্থাৎ জগন্ময়বাবু তাঁর হাঁটার পথে একবারটি থেমে যেদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, সেইদিকে।

"কেন, যাব না কেন? কী হবে গেলে?"

"বিষ আছে।"

"বিষ? কীসে?"

"ওই গাছে।"

সত্যি বলতে কী গাছটা দেখেই জগন্ময়বাবু থেমেছিলেন। ফুলগাছ। বুনো ফুল সম্ভবত। রাস্তা থেকে হাত বিশেষ দূরে একটা ঢিপি, তার ওপরে ওই একটি মাত্র গাছ। কাছাকাছির মধ্যেও যাকে গাছ বলে তা আর নেই। এ গাছটা কোমর অবধি উঁচু। তেকোনা ছেটো ছোটো পাতা, আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভারী সুন্দর হলদে কমলা আর বেগুনি রঙের ফুল। জগন্ময়বাবুর অবাক লাগছিল এই কারণেই যে

গত তিনদিন ঠিক এই রাস্তা দিয়েই হাঁটা সত্ত্বেও ওই ঢিপি আর ওই গাছ ওঁর চোখে পড়েনি। অবিশ্যি হাঁটার সময় অর্ধেক দৃষ্টি পথে রেখেই চলতে হয়, বিশেষ করে সে-পথ যদি কাঁচা আর অজানা হয়। কাজেই না-দেখাটা আশ্চর্য নয়।

ছেলেটি এখনও সেইভাবেই দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে দেখছে।

"কী নাম তোর?" জগন্ময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"ভগওয়ান।"

"ওরেব্বাবা! — বাংলা শিখলি কোথায়?"

"ইস্কুলে।"

"আমার পিছন পিছন আসছিলি কেন?"

"আমার বাড়ি ওই তো।"

জগন্ময়বাবু দেখলেন যেদিকে ঢিপি সেইদিকেই আরও সিকি মাইলটাক দূরে বাঁশবনের লাগোয়া খাপ্‌রার ছাউনি দেওয়া কুটির।

জগন্ময়বাবু আবার চাইলেন ছেলেটির দিকে। আরও দু-একটা প্রশ্ন করতে হয়। সে ফস্ করে যেতে তাঁকে এভাবে নিষেধ করবে কেন?

"গাছের কী নাম?"

"জানি না।"

"বিষ আছে জানলি কী করে?"

"মরে যায় যে।"

"কী মরে যায়?"

"সাপ, ব্যাং, ইঁদুর ... পাখি... "

"কী করে মরে যায়? গাছে বসলে? না ফুল খেলে?"

"কাছে গেলে।"

"কাছে মানে? কত কাছে?"

"চার হাত। পাঁচ হাত।"

"তুই তো খুব গোপ্‌পে দেখছি! নাকি গাঁজা ধরেছিস এই বয়সেই? তোর মাস্টারকে জিগ্যেস করিস ইস্কুলে। ফুলগাছে এরকম বিষ হয় না কখনও।"

ছেলেটি চুপ করে চেয়ে আছে।

"আমি এখানে নতুন লোক। চেঞ্জের জন্য এসেছি। আমার শরীর খারাপ,

বুঝেছিস? ওরকম গুল-টুল মারিসনি। এদেশে ওরকম ফুলের কথা কেউ শোনে নি। ওরকম হয় না।"

"এদেশের না। সাহেব এনেছিল।"

ছেলেটা দেখছি নাছোড়বান্দা। বিশ্বাস করাবার জন্য বদ্ধপরিকর।

"কোন্ সাহেব?"

"আপনি যে বাড়িতে আছেন, সেই বাড়িতে ছিল।"

"কবে এসেছিল?"

"যেবার খরা হল তার আগের বার।"

"কী নাম?"

"নাম জানি না। লাল মুখ, কটা চুল।"

"সে এসে এই ডিপির ওপর পুঁতে দিয়ে গেছে গাছ?"

"জানি না।"

"তবে?"

"সাহেব যাবার পরেই গাছ হল, হোই যে বন, ওইখানে ঘুরত হাতে কাচ নিয়ে।"

বটানিস্ট-টটানিস্ট হবে, জগন্ময়বাবু ভাবলেন। ভারী তাজ্জব কথাবার্তা বলছে ছেলেটি।

"ওই দেখুন না।" — ছেলেটি আবার আঙুল দেখাল। "ওই ঢিপিটার পাশে। ওই যে পাথরটা, তার ঠিক ডান পাশে।"

জগন্ময়বাবু দেখলেন। একটা সাদা সাদা কী যেন দেখা যাচ্ছে।

"কী ওটা?"

'সাপ।"

"সাপ?"

"সাপ ছিল। এখন হাড়। মরে গেছে। চিতি সাপ। বিষের দম ছাড়ে ওই ফুল।"

জগন্ময়বাবু বাইনোকুলারটা চোখে লাগালেন। হ্যাঁ, সাপই বটে। সাপের কঙ্কাল। ফুলটাও দেখলেন দুরবিনের ভিতর দিয়ে। যত সরল মনে হয়েছিল তত নয়। কোনো রংটাই সরল নয়। হলদের মধ্যে বেগুনির ছিটে, বেগুনির মধ্যে হলুদ, অরেঞ্জের মধ্যে সাদা আর কলো।

যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে আরও একটা মরা জিনিস দেখতে পেলেন জগন্ময়বাবু।

এটাও সরীসৃপ, তবে এটার পা আছে চারটে। গিরগিটি বা বহুরূপী জাতীয় কিছু। এটা গত দু-একদিনের মধ্যে মরেছে।

"তা এরা সব অ্যাদ্দিনে সেয়ানা হয়ে যায়নি? এখনও আসে আর মরে?"

"রোজ মরে, একটা দুটো।"

"কই অত তো দেখছি না। মাত্র দুটো তো।"

"ঢিপির পিছনে আছে। বেশি মরলে বাঁশ দিয়ে টেনে এনে সাফ করে দেয়।"

"কে?"

"আমার বাবা। আমিও!"

"তা বাঁশ দিয়ে গাছে ঘা মেরে ওটাকেও সাবাড় করে দিস না কেন? তাহলেই তো আপদ চুকে যায়।"

"আবার গজায়।"

"বলিস কী!"

"পুড়িয়ে দিলেও আবার গজায়।"

জগন্ময়বাবু ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন না। কারণ পাঁচ আনার বেশি বিশ্বাস হয়নি এখনও তাঁর মনে। যেটুকু হয়েছে তার কারণ একবার কোন্ বইয়ে যেন মাংসাশী গাছের কথা পড়েছিলেন। বিশ্বচরাচরে অনেক আশ্চর্য জিনিস আছে যার অনেকই এখনও হয়তো মানুষের অগোচরে রয়েছে।

"আরও আছে এই গাছ?"

"আছে।"

"কোথায়?"

"ওই বনে আছে।"

"কাছাকাছির মধ্যে এই একটাই?"

"আর দেখিনি বাবু।"

ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে এখানে এসে সুদৃশ্য স্বাস্থ্যময় নিরিবিলি পরিবেশ আর টাটকা সস্তা সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও একটা উপরি লাভ হয়েছে জগন্ময়বাবুর। এটার আশাই করেননি। ফিরে গিয়ে আপিসে বলার মতো গল্প হল একটা। বিষফুল! গাছের নিশ্বাসে বিষ! ওই দুটি মৃত প্রাণী না দেখলে ছেলেটির কথা তিনি আদৌ বিশ্বাস করতেন না। তবে সে এইভাবে বানিয়ে কথা

বলবে কেন সেটাও একটা প্রশ্ন। এ ধরনের প্র্যাকটিক্যাল জোক একমাত্র শহরেই সম্ভব — আর তাও সে পয়লা এপ্রিলে। গাঁয়ে দেশে যে এমন জিনিস হয় না সেটা চিরকাল শহরে বাস করেও বেশ বুঝতে পারলেন জগন্ময়বাবু। আর এটাও বুঝলেন যে তাঁর বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে আজ একটা স্মরণীয় দিন। বিষফুলের কথা আজ তিনি প্রথম শুনলেন।

অথচ মজা এই যে কাঠঝুমরিতে আসার কথাই ছিল না তাঁর। গিয়েছিলেন ডালটনগঞ্জ, তাঁর বোনের বাড়িতে দিন পনেরো ছুটি কাটিয়ে আসবেন বলে। গত বছর থেকেই একটা হাঁপের কষ্ট অনুভব করতে শুরু করেছেন জগন্ময়বাবু। ডাক্তার — শুধু ডাক্তার কেন, চেনাশোনা সকলেই — বলেছেন ড্রাই ক্লাইমেটে ক-টা দিন কাটিয়ে আসার কথা। — "বিয়ে তো করোনি; এত টাকা কার জন্য পুষে রাখছ? একটু খরচ-টরচ করো। আমাদের পিছনে না করবে তো অন্তত নিজের পিছনেই করো!" — এই 'এত টাকা'র ব্যাপারটা জগন্ময়বাবুর মোটামুটি নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসামুদ্রিক ঢেউয়ের মতো। তিনদিন রেসের মাঠে যাওয়ার পর চতুর্থ দিনই জ্যাকপট পেয়ে যান ভদ্রলোক। এক ধাক্কায় চৌষট্টি হাজার টাকা। অথচ ঘোড়া নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাননি, রেসের বইয়ের পাতা খুলে দেখেননি; যাওয়া কেবল এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। এবং কিছুটা কৌতুহলবশত। ডাক্তার নন্দী বলেন হাঁপানির টানটা ওই টাকা পাওয়ার পর থেকেই! তা হতে পারে। জগন্ময়বাবু নিজে লক্ষ করেছেন যে এই আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনের ফলে তাঁর মধ্যে কিছু চারিত্রিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে! যেমন, তিনি সাধারণ অবস্থায় অনেক বেশি হাতখোলা ছিলেন, এখন হিসেবি হয়ে পড়েছেন। গাড়ি কেনার সামর্থ্য হয়েছিল, কিনে-কিনেও কেনেননি। বন্ধুদের ভোজ দেবেন বলে শেষ পর্যন্ত সন্দেশের ওপর সেরেছেন। আদরের ভাইপো তিলুর জন্মদিনের জন্য চুয়াল্লিশ টাকা দামের রেলগাড়িটা দর করে পয়সা বার করার সময় মত বদলে সাতাশ টাকারটা কিনেছেন। শুকনো ক্লাইমেটে দিন পনেরো কাটিয়ে আসার পরিকল্পনাটা যখন মাথায় এল, তখন বন্ধুরা অনেকেই অমুক জায়গায় অমুক হোটেল অমুক ট্যুরিস্ট লজের কথা বলেছিল, সে সবই জগন্ময়বাবুর সামর্থ্যের মধ্যেই ছিল; কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি খরচ বাঁচিয়ে ডালটনগঞ্জে বোনের কাছে যাওয়াই স্থির করেন। সেখানেই থাকতেন পুরো ছুটিটা। কিন্তু, দুই ভাগনের একসঙ্গে চিকেন পক্স হয়ে যাওয়ায় ভগ্নীপতি

নিজেই বললেন, "একবার কাঠঝুমরিতে মূর সাবেহের বাংলোটার খোঁজ করে দেখুন না। বিলিতি টাইপের বাংলো, খাওয়াদাওয়া সস্তা আর ভালো, চেঞ্জও হবে, বিশ্রামও হবে। অবিশ্যি সাহেব আর নেই — মাস চারেক হল মারা গেছেন। তবে গিন্নি আছেন। এখানেই থাকেন। ওঁরা ভাড়া দেন ওদের বাংলো এটা আমি জানি।"

বুড়ি মিসেস মূর কোনো আপত্তি তোলেননি। তবু বলেছিলেন, "এ দিকটা তো আমার স্বামীই দেখতেন। — ওঁর কয়েকজন বাঁধা খদ্দের ছিল। — তবে তাদের তো কোনো চিঠি টেলিগ্রাম দেখছি না; তোমায় দিতে আপত্তি নেই, তবে পনেরো দিনের বেশি তোমাকে থাকতে দিতে পারব না, ভেরি সরি।"

"তার প্রয়োজনও হবে না।"

তিনদিন ডালটনগঞ্জে থেকে এই সবে তিনদিন হল গত শুক্রবার জগন্ময়বাবু মূর সাহেবের বাংলোতে এসে উঠেছেন। আর এসেই বুঝেছেন যে তাঁর মতো মানুষের পক্ষে ছুটি কাটানোর আর এর চেয়ে ভালো জায়গা হয় না। প্রথমত, ক্লাইমেট। এসে অবধি একদিনও নিশ্বাসের কষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়ত, কলকাতার মানুষ জগন্ময় বারিক কল্পনাই করতে পারেননি যে ট্রাম বাস লরি ট্যাক্সি রেডিয়ো টেলিফোন টেলিভিশন সিনেমা মানুষের কোলাহল ইত্যাদি বাদ হয়ে গেলে কী আশ্চর্য টনিকের কাজ হয়। এখন বুঝতে পারছেন যে কলকাতার মানুষ সব সময়ই কোণঠাসা; সত্যি করে হাত পা-ছড়ানো যে কাকে বলে সেটা তিনি বুঝেছেন কাঠঝুমরিতে এসে।

মূর সাহেবের বাংলো প্রথম দর্শনেই জগন্ময়বাবুর মনটা ভালো হয়ে গিয়েছিল। দূরে পিছনে পাহাড়ের লাইন, তারপর এগিয়ে এলে প্রথমে বন, বনের পর সমতল প্রান্তর — তার এখানে ওখানে ছড়ানো ছোটো বড়ো টিলা, আর আরও এগিয়ে এলে লম্বা লম্বা গাছ পিছনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিমনি আর টালির ছাতাওয়ালা বিলিতি পোস্টকার্ডের ছবির মতো মূল সাহেবের বাংলো। সেই বাংলোর বারান্দা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে ঘরগুলোর ছিমছাম চেহারা, আসবাবের পারিপাট্য, জানালা ও দরজার পর্দার নকশা ইত্যাদি দেখে জগন্ময়বাবুর বিশ্বাস হল যে রেসের মাঠে জ্যাকপট পাওয়ার চেয়ে ছুটি -ভোগের জন্য এমন বাংলো পাওয়া কিছু কম ভাগ্যের কথা না।

এখানে এসেই জগন্ময়বাবু তাঁর দিনের রুটিন ঠিক করে নিয়েছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে হাঁটতে বেরোন, ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট। তারপর বাংলোর

বারান্দায় বা সামনের কম্পাউন্ডে বসে ম্যাগাজিন পাঠ — খান পঁচিশেক রিডারস ডাইজেস্ট নিয়ে এসেছেন তিনি বোনের বাড়ি থেকে, — তারপর স্নান-খাওয়া সেরে দিবানিদ্রা। বিকেলে চায়ের পর আবার পদব্রজে ভ্রমণ। রাত্রে সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে ঘুম।

আজ সকালে বেড়িয়ে ফিরে এসেই চৌকিদার বনোয়ারিকে জিজ্ঞেস করলেন বিষফুলের কথা। অবিশ্যি প্রথমেই ফুলের কথা না জিজ্ঞেস করে সেদিকে অগ্রসর হওয়ার একটা রাস্তা তৈরি করে নিলেন।

"ভগওয়ান বলে কোনো ছেলেকে চেন?"

"হাঁ বাবু। ভিখুয়াকা লড়কা।"

'ভিখুয়া কে?'

চৌকিদার বলল ভিখুয়া কাঠের মজুরি করে। চৌধুরীবাবুদের কাঠের গোলা আছে এই কাঠঝুমরিতেই, সেখানে কাজ করে।

"ভগওয়ানের বাড়ির দিকে রাস্তার ধারে একরকম ফুলের গাছ আছে। সে-গাছ নাকি বাতাসে বিষ ছড়ায়। — জানো?"

"হাঁ বাবু।"

"কথাটা সত্যি?"

"মর জাতা হ্যায় ... সাঁপ, চুহা, বিচ্ছু-উচ্ছু ..."

বনোয়ারি রুটি আর ডিমের ওমলেট রেখে টি-পট আনতে গেল।

"এখানে এক সাহেব এসেছিল বছর তিনেক আগে?" বনোয়ারি ফিরে এলে পর জিজ্ঞেস করলেন জগন্ময়বাবু। বনোয়ারি বলল, সাহেব অনেক এসে থেকেছে এখানে। এককালে মূর সাহেব গিন্নিকে নিয়ে নিজেই আসতেন প্রতি শীতকালে। তিন বছর আগে কোনো সাহেব এসেছিল কি না তা বানোয়ারির মনে নেই।

জগন্ময়বাবু ঠিক করলেন বিকেলে একবার বাজারের দিকে যাবেন। বাজার পান্নাহাটে — এখান থেকে মাইল দুয়েক। রেলস্টেশনও সেখানেই। এখানে আসতে হলে স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশা নিতে হয়। পান্নাহাট থেকে ট্রেন দরে সোজা ডালটনগঞ্জ যাওয়া যায়। প্রথম দিন এসেই জগন্ময়বাবু একবার বাজারের দিকে গিয়েছিলেন। দুজন বাঙালির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। পোস্টমাস্টার নুটবিহারী মজুমদার, আর পবিত্রবাবু বলে এক ভদ্রলোক, যিনি রয়েল হোটেলে উঠেছেন।

মিঠে পানের খোঁজ করতে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গো আলাপ। বললেন আগেও এসেছেন কাঠঝুমরি। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের কাজ করেন। রয়েল হোটেল না কি নামেই হোটেল — "বলতে পারেন থ্রি-স্টার সরাইখানা।" মনে হল বেশ রসিক লোক। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি না। "আপনি উঠেছেন কোথায়? কাঠঝুমরিতে তো থাকবার জায়গা নেই। চৌধুরী কোম্পানির কারুর সঙ্গো চেনা আছে বুঝি?"

"আজ্ঞে না, আমি উঠেছি মূর সাহেবের বাংলোতে।"

"ও — ওই শিশু গাছে ঘেরা কটেজ বাড়িটা?"

জগন্ময়বাবু বললেন যে গাছে ঘেরা ঠিকই, তবে শিশু কি না বলতে পারবেন না, দেখে তো বুড়ো বলেই মনে হয় — হে হে। — "আমি মশাই সেন্ট পার্সেন্ট শহুরে। বড়ো জোর আম জাম কলা নারকেল আর বট-অশ্বত্থটা চিনতে পারি — তার বাইরে জিজ্ঞেস করলেই মুশকিল।

এই পবিত্রবাবু আর নুটবিহারীকে আজ একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে। চৌকিদারের কনফারমেশন যথেষ্ট নয়। আসলে জগন্ময়বাবু কলকাতায় গিয়ে এই বিষফুলের বিষয় কিছু লিখতে চান। এখনও পর্যন্ত কেউ লেখেনি। এই একটা ব্যাপারে পায়োনিয়ার হবেন তিনি।

নুটবিহারীবাবুকে জিজ্ঞেস করে বিশেষ ফল হল না। বললেন, "আমি মশাই সবে লাস্ট ইয়ারে বদলি হয়ে এখানে এসেছি। স্থানীয় সংবাদ বিশেষ আমার কাছে পাবেন না। আপনি বরং আর কাউকে জিজ্ঞেস করুন।"

পোস্টাপিস থেকে জগন্ময়বাবু গেলেন বাজারের দিকে। পান কেনা আছে, আর যদি একটা এক্সারসাইজ বুক পাওয়া যায় তো কজের কাজ হবে। লেখার জন্য তৈরি হতে হবে তো। কলম আছে সঙ্গো, খাতা আনেননি।

পবিত্রবাবুর সঙ্গো দেখা হয়ে গেল একটা চায়ের দোকানের সামনে। বেঞ্চিতে বসে বাংলা খবরের কাগজ পড়ছেন। বললেন, "আসুন, চা খান। ওহে ভরদ্বাজ — দু কাপ — একের জায়গায় দুই"।

জগন্ময়বাবু সোজা আসল প্রশ্নে চলে গেলেন।

"আপনি বিষফুলের নাম শুনেছেন?"

পবিত্রবাবু কাগজটা ভাঁজ করে জগন্ময়বাবুর দিকে চোখ তুললেন। "হলদে কমলা

বেগুনি? তালহার যাওয়ার পথে ডানদিকে রয়েছে তো? একটা ঢিপির ওপরে?"

"আপনি তো সব জানেন দেখছি!"

"বললুম তো — চারবার ঘুরে গেছি এখানে। বছর দুই থেকে দেখছি ওটা। প্রথম যেদিন দেখি সেদিন ঢিপির পাশে একটা আস্ত শুয়োরছানা মরে পড়েছিল।"

"বলেন কী! তা এই নিয়ে আপনি কাউকে বলেননি কিছু? আপনি তো কলকাতার লোক — কাগজে-টাগজে —?"

পবিত্রবাবু উড়িয়ে দিলেন। "বলবার কী আছে মশাই? প্রকৃতির খামখেয়াল কত রকম হয় সব নিয়ে কী আর কাগজে লেখে? আরও কত হাজার রকম বিষফুল বিষফল বিষপোকা বিষপাখি রয়েছে পৃথিবীতে কে জানে। আরে মশাই, কলকাতাতে বাস, সেখানে হাওয়াটাই বিষাক্ত। প্রতি নিশ্বাসে পাঁচ সেকেন্ড করে আয়ু কমে যাচ্ছে — সেদিন দেখলুম কোথায় জানি লিখেছে। সেখানে ফুলের বিষ নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে মশাই?"

"কিন্তু এখানকার লোক ... এদের পক্ষে তো এটা একটা ডেঞ্জার মশাই।"

"কাছে না ঘেঁষলেই হল। পাঁচ-সাত হাত দূরে থাকলেই তো সেফ। সেকথা এখানে সবাই জানে।" ....

জগন্ময়বাবু চা খেয়েই উঠে পড়লেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি সূয্যি ডুবলেই ঝপ করে ঠান্ডা পড়ে। সর্দিগর্মির রিস্কটা না নেওয়াই ভালো।

চায়ের দোকানের পাশেই একটা মনিহারি দোকান থেকে খাতা কিনে ভদ্রলোক যখন বাড়ি ফিরলেন তখন সোয়া ছ-টা। মনে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছেন তিনি। পাকা কনফারমেশন পাওয়া গেছে, এবার উনি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন। লেখাটা কোনো উদ্ভিদবিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে একটা বড়ো কাজ হবে। কাঠঝুমরির নামটাও লোকের জানা উচিত। টুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট জানে কি নামটা? মনে তো হয় না।

লেখার অভ্যেস নেই তাই খাতা খুলে হাতের কলমটার ওপর থুতনিটা ভর করে আধঘণ্টা বসে থেকেও কোনো ফল হল না। এত চট করে হবে না। হাতে আরও দশ দিন সময় আছে। ধীরে সুস্থে ভেবেচিন্তে লিখতে হবে। বিষফুল ...। নামটা দুবার আপন মনে উচ্চারণ করলেন জগন্ময়বাবু। বিষফুল ....! এই নামের লেখা লোকে না পড়ে পারবে না।

।।২।।

আজ আর বাইনোকুলারের দরকার হল না। সকাল সাতটার সময় ঢিপিটার কাছে পৌঁছে রাস্তা থেকে খালি চোখেই জগন্ময়বাবু যে মৃত প্রাণীটা দেখতে পেলেন সেটা হল একটা খরগোশ। মরা সাপের কঙ্কাল আর মরা গিরিগিটিও এখনও রয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়লে হয়তো জায়গাটা পরিষ্কার করবে এসে ভগওয়ান বা ভগওয়ানের বাপ।

জগন্ময়বাবু হিসেব করতে চেষ্টা করলেন গাছটা কত দূর হবে রাস্তা থেকে। বিশ হাত? পঁচিশ হাত? তাঁর একটা অদম্য ইচ্ছে হচ্ছে একটু এগিয়ে গিয়ে গাছটাকে আর-একটু ভালো করে দেখার। পাঁচ হাতের বেশি কাছে না গেলেই তো হল।

কিন্তু ওই ছোকরার অনুমান যদি ভুল হয়?

যদি সাত হাত, আট হাত দূর পর্যন্ত ফুলের প্রভাব পৌঁছায়?

জগন্ময়বাবু ঘাসের ওপর দিয়ে তিন পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে এলেন। সাপ, খরগোশ, গিরগিটি। শুয়োর। পোকামাকড়ের কথা ছেলেটি বলেনি। ফড়িং পিঁপড়ে মশামাছি — এ সবই কি এই গাছের বিষে মরে? না ছোটো জিনিস রেহাই পায়? আর বড়ো জিনিস? তার লেখার জন্য এগুলো জানা দরকার। আজ ছেলেটিকে দেখছেন না। একবার তার বাড়ি যাবেন নাকি? একটা ইন্টারভিউ করবেন তাকে — যেমন অনেককে খবরের কাগজে করে?

প্রশ্নটা মাথায় আসতেই মনে হল — তাড়া নেই, সব হবে। ধীরে সুস্থে, ধীরে সুস্থে। হাতে আরও সাতদিন সময়।

এখানে জলটা ভালো, তাই খিদে হয় প্রচুর। ব্রেকফাস্টের কথা চিন্তা করতে করতে জগন্ময়বাবু বাড়ি ফিরলেন। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বিশাল কম্পাউন্ড। দুটো কাঠের গেট, একটা পশ্চিমে, একটা উত্তরে।

উত্তরের গেটে — যেটা দিয়ে জগন্ময়বাবু এখন ঢুকলেন — এখনও একটা কাঠের ফলকে মুর সাহেবের নাম রয়েছে। গেট থেকে সোজা রাস্তা দিয়ে কটেজের সামনের বারান্দায় শেষ হয়েছে। বড়ো বড়ো গাছগুলো, যেগুলোকে পবিত্রবাবু শিশু বললেন, সেগুলো কটেজের পিছন দিকে। এদিকে দক্ষিণে যে দুটো বড়ো গাছ রয়েছে সেগুলো শিশু হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সেগুলোর নামও জগন্ময়বাবু জানেন না। এর মধ্যে যেটা দূরের গাছ, সেটার ডালপালাগুলো প্রায় সাদা আর বেশ ছড়ানো। গুঁড়িটা কালো

হলে হয়তো আরও সহজে চোখে পড়ত, কিন্তু সাদা হওয়া সত্ত্বেও, খুব বেশি দূরে নয় বলে গুঁড়ির পাশের চেনা গাছটা জগন্ময়বাবুর দৃষ্টি এড়াল না।

সেই একই গাছ, একই বিচিত্র ফুল।

বিষফুল!

জগন্ময়বাবুর পেট থেকে খিদেটা ম্যাজিকের মতো উবে গেল।

এ গাছ কাল ওখানে ছিল না। জগন্ময়বাবু ওই সাদা গুঁড়িটা থেকে হাত দশেক দূরে বনোয়ারিকে দিয়ে ডেকচেয়ারটা আনিয়ে তাতে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন। তখন তাঁর কোনো কাজ ছিল না, কেবল শরৎকালের মিঠে রোদটা উপভোগ করা। তাঁর চোখ তখন চতুর্দিকে ঘুরছে, এমনকি সাদা গুঁড়িটার দিকেও। এটা মনে আছে, কারণ জগন্ময়বাবুর তখন মনে হয়েছিল গুঁড়িটার রঙের সঙ্গে ইউক্যালিপটাসের গায়ের রঙের মিল আছে। ওই আর-একটা গাছ ওঁর চেনা।

ইউক্যালিপ —

ওটা কী?

একটা পাখি!

খয়েরি রং — মাথা থেকে ল্যাজের ডগা অবাধি। শালিকের চেয়ে ছোটো। পাখিটা মাটিতে খুঁটে খুঁটে কী জানি খাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে খাওয়া থামিয়ে থামিয়ে মাথা তুলে লাফ মেরে পাখিটা ফুলগাছটার দিকে আরও এগিয়ে গেল। জগন্ময়বাবু আর অপেক্ষা না করে সজোরে দুটো তালি মারলেন। পাখিটা তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে উড়ে পালিয়ে গেল। জগন্ময়বাবু হাঁফ ছাড়লেন। কিন্তু গাছটা তো রয়ে গেল।

ওটার একটা ব্যবস্থা করা যায় না? সামনে রাস্তায় অনেক ঢেলা পড়ে আছে।

একটা ঢেলা হাতে তুলে নিয়ে জগন্ময়বাবু গাছটাকে তাক করে নিক্ষেপ করলেন। গাছটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। লেগেছে! কিন্তু কোনো ফল হবে কি একটা ঢিলে?

জগন্ময়বাবু অনুভব করলেন যে তাঁর মাথায় খুন চেপেছে। পর পর ত্রিশটা ঢেলা মারলেন গাছটার দিকে। কোনোদিন ক্রিকেট খেলেননি, তাই বোধহয় অর্ধেক ঢেলা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল; কিন্তু বাকিগুলো লাগল। গাছটা নুয়ে পড়েছে।

"উয়ো ফির খাড়া হো যায়গা বাবু।"

ভগওয়ান। গেটের বাইরে বই হাতে দাঁড়িয়ে দেখছে, মুখে মৃদু হাসি!

"হোক গে খাড়া," বললেন জগন্ময়বাবু। "কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত।"

ভগওয়ান চলে গেল।

ঘটনাটা যে চৌকিদার আর মালিও দেখেছে সেটা বাংলোর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বুঝলেন জগন্ময়বাবু। বোঝাই যাচ্ছে দুটোই অকর্মার ঢেঁকি। তাঁকে একটু হেল্‌প করতে পারল না এগিয়ে এসে?

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে মনে হল যে চৌকিদার আর মালির এই যে নিস্পৃহ ভাব, তার জন্য হয়তো উনি নিজেই কিছুটা দায়ী। এখানে এসেই বোধহয় ওদের দুজনের হাতে কিছু আগাম বকশিশ গুঁজে দেওয়া উচিত ছিল। মালি তো স্টেশনে গিয়েছিল ওকে আনতে। মিসেস মূর টেলিগ্রামে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কুলির বদলে উনি মালির পিঠেই মাল চাপিয়েছিলেন। একটা সুটকেস, একটা বেডিং, একটা বড়ো কল-লাগানো ফ্লাস্ক। নিজের হাতে নিয়েছিলেন কেবল ছাতা আর বোনের দেওয়া এক হাঁড়ি মিষ্টি। বাংলোয় পৌঁছে উনি মালির জন্য দুটো টাকা বার করেও আবার পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন — "যাওয়ার দিন পুষিয়ে দেব; আগে দেখি না ব্যাটারা কীরকম কাজ করে।"

কাজ অবিশ্যি ভালোই করছে দুজনে। কিন্তু কাজের বাইরে আগ বাড়িয়ে এসে দুটো কথা বলা, কী চাই না - চাই, কোনো অসুবিধে হচ্ছে কী না, এসব জিজ্ঞেস করা — এটা দুজনের একজনও করেনি। কাঠঝুমরির এই একটি ব্যাপারই জগন্ময়বাবুর কাছে 'লেস দ্যান পারফেক্ট' বলে মনে হয়েছিল। এখন বুঝছেন দোষটা খানিকটা ওঁর নিজেরই।

"এই বাড়ির আশেপাশে ওই গাছ আরও আছে নাকি?" — চায়ে চিনি নাড়তে নাড়তে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলেন জগন্ময়বাবু। চৌকিদার বলল বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে ওই গাছ ও আজ এই প্রথম দেখল।

"একি রাতারাতি গজিয়ে যায় নাকি?"

"ওইসাই তো মালুম হোতা বাবু।"

"একটু খেয়াল রেখো তো। দেখলে আমায় বলবে।"

বনোয়ারি বলার আগেই জগন্ময়বাবুর চোখে পড়ল। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে এসেই।

বারান্দার পুব কোনার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একগোছা চেনা ফুল। ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে ফুলগুলো। হাত পনেরোর বেশি দূরে নয়।

জগন্ময়বাবু বুঝতে পারলেন তাঁর পা দুটো কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। কোনো মতে এক পা পাশে সরে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লেন বেতের চেয়ারের ওপর। একবার মালি বলে ডাকতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। গলা শুকিয়ে গেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। হাত-পা ঠান্ডা।

হাওয়াটা পুব দিক থেকেই আসছে। গাছের দিক থেকেই। তার মানে ওই ফুলের বিষাক্ত প্রশ্বাস —

জগন্ময়বাবু আর ভাবতে পারলেন না। এখানে বসা চলবে না। এরমধ্যেই তিনি অনুভব করছেন তাঁর নিশ্বাসের কষ্ট।

শরীর ও মনের অবশিষ্ট সব বলটুকু প্রয়োগ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে টলতে টলতে বৈঠকখানা পেরিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকে শয্যা নিলেন জগন্ময়বাবু।

চৌকিদার রাত্রে কী রান্না হবে জিজ্ঞেস করতে এলে পর বললেন, "কিচ্ছু না — খিদে নেই।"

তা সত্ত্বেও বনোয়ারি নিজে থেকেই এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে এল বাবুকে খাওয়ানোর জন্য। অনেক অনুরোধের পর জগন্ময়বাবু কোনো রকমে অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

দূরে মাদল বাজছে। বাজারে শুনেছিলেন কোথায় জানি মেলা বসবে। সাঁওতালের নাচ হবে সেখানে। ক-টা বাজল কে জানে। কম্বলের তলায় শুয়ে জগন্ময়বাবু অনুভব করলেন যে তাঁর এখনও শীত লাগছে। আলনা থেকে আলোয়ানটা নিয়ে কম্বলের ওপর চাপিয়ে দিতে খানিকটা কাজ হল। তার ফলেই বোধ হয় একটা সময় জগন্ময়বাবু বুঝলেন তাঁর চোখের পাতা দুটো এক হয়ে আসছে।

এর আগের ক-দিন এক ঘুমে রাত কাবার হয়েছে। আজ হল না। চোখ খুলতে ঘরে আলো দেখে প্রথমে খটকা লেগেছিল, তারপর মনে পড়ল নিজেই বনোয়ারিকে বলেছিলেন আজ ঘরে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে রাখতে। এখনও শীত। হাওয়াটা ওই বাইরের দিকের জানালাটা দিয়েই আসছে বোধ হয়। কিন্তু ওটা তো বন্ধ করেছিলেন উনি শোওয়ার আগে। কেউ খুলল না কি?

জগন্ময়বাবু ঘাড় তুললেন দেখবার জন্য।

জানালার পাশেই ড্রেসিং টেবিল। তার ওপরেই রাখা লণ্ঠনের আলো পড়েছে তার পাল্লায়।

শুধু পাল্লায় নাচ বাইরে থেকে যে জিনিসটা উঁকি মারছে, তার ওপরেও। সেই আলোতেই চেনা যাচ্ছে জিনিসটাকে।

এ সেই একই গাছ। একই গাছ, একই ফুল। হলদে বেগুনি কমলা।

বিষফুল!

জগন্ময়বাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর তলপেট থেকে যে আর্তনাদটা কণ্ঠনালি বেয়ে ওপরের দিকে উঠে আসছে, সেটা মুখ দিয়ে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংজ্ঞা হারাবেন।

আর হলও তাই।

কামরাটা খালি পেয়ে জগন্ময় বারিক একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কারণ লোকের সান্নিধ্য এখন তাঁর ভালো লাগছে না। কাঠঝুমারিতে এখন স্বপ্নের মতো সুন্দর প্রথম তিনটি দিন গত দু-দিনে কী করে এমন বিভীষিকাময় পরিণত হতে পারে, সেই নিয়ে তিনি এই সাত ঘণ্টার জার্নির মধ্যে একটু চুপচাপ একা বসে ভাবতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গার্ডের হুইসলের সঙ্গে সঙ্গে একটি চেনা লোক তাঁর কামরায় এসে উঠলেন। পান্নাহাটের পোস্টমাস্টার নুটবিহারী মজুমদার। ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিনের পর আর দেখা হয়নি।

"সে কি মশাই! এর মধ্যে ফিরে চললেন নাকি? নাকি আপনিও বেতোল যাচ্ছেন?"

"বেতোল?"

"এর পরের স্টেশন। মেলা বসেছে সেখানে। গিন্নির হুকুমে সওদা করতে যাচ্ছি।"

"ও।"

"আপনি কোথায় চললেন?"

"ডালটনগঞ্জ।"

"শরীর খারাপ হল না কি? এই দু-দিনেই এত পুল্‌ড ডাউন ...?"

"হাঁ ... একটু ইয়ে ..."

নুটবিহারীবাবু মাথা নেমে একটু ফিক্ করে হেসে বললেন, "যাক, ভদ্রলোকের লাকটা ভালো।"

"লাক?"

"পবিত্রবাবুর কথা বলছি।"

"কেন?"

"আরে, উনি তো আজ দশ বছর হল বছরে দুবার করে মূর সাহেবের বাংলোতে এসে থাকেন। ওটা একরকম ওঁর মোনোপলি। অক্টোবর আর মার্চ। লিখতে আসেন। বড়ো রাইটার তো। পবিত্র ভট্টাচার্যি — নাম শোনেননি? লেখেন, আর ভগবান বলে একটা কাঠুরের ছেলেকে বাংলা শেখান। শখের মাস্টারি! একটু আদর্শবাদী প্যাটার্নের লোক আর কি। আপনি গেচেন শুনে নেচে উঠবেন। ভারী আক্ষেপ করছিলেন নিজের ডেরা ছেড়ে হোটেলে থাকতে হচ্ছে বলে। বললেন, বুড়ো মূর বেঁচে থাকলে এ গোলমাল হত না, বুড়িই গণ্ডগোলটা করেছে।'

বেতোল স্টেশনে নুটবিহারী নেমে যাওয়ার পর গাড়িটা ছাড়বার ঠিক মুখে জগন্ময়বাবু দেখলেন প্ল্যাটফর্মের ধারে লোহার রেলিং-এর পিছনে ফুলের ঝাড়টা। একটা-আধটা নয়, এক মাঠ জুড়ে কমপক্ষে একশোটা।

আর তারই মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে খেলা করছে তিনটি ছাগলছানা!

মধ্যরাতের ভয়ংকর

নবনীতা দেব সেন

মা বললেন, "খুকু, এ জিনিস চলতে পারে না। তুমি কি না তোমার মেয়েকে খুন করবার সব ব্যবস্থা করে দিলে। কেন, চার চাকা চালালে কী দোষ ছিল?"

মেয়েকে তো লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছি সেই কবেই। সে কিছুতেই চার চাকা ছোঁবে না, তো আমি কী করতে পারি? আর মোপেড কী তাকে আমি কিনে দিয়েছি? একুশ হয়েছে, অ্যাকাউন্ট থেকে নিজেই টাকাটা তুলে কিনে ফেলেছে, বলেছে চাকরি করে শোধ করে দেবে, একদিন না একদিন। আরে, আমারই কি ইচ্ছে মেয়ে খুন করি? মার ধারণা আমি যেমন মার সব কথা শুনে চলি, আমার মেয়েও বুঝি তার মায়ের কথায় তেমনি ওঠে বসে। আরে জমানা বদল গয়া — এখন আমিই যে দুজনের কথাতেই উঠিট বসি, একবার আমার মায়ের কথায়, আর-একবার আমার মেয়ের কথায়, তা মা বুঝেও বুঝতে চান না। আসলে আমার বড়ো মেয়েটি প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী। তাকে বকুনি দিতে আমার প্রবলা গর্ভধারিণীও সাহস পান না, তাই ঝিকে বকে নাতনিকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা। ওদিকে ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটিতে আমার বেশ কিছুটা ঘাটতি আছে। কাক-চিলেও ঠুকরে যায় সুযোগ পেলে, মা জননী, কন্যাকুমারী এদের তো কথাই নেই।

"কী বলে এই ডেঞ্জারাস রিস্ক তুমি নিলে? রাস্তাঘাটে গাড়ির ছড়াছড়ি। লাইসেন্স সব নামেমাত্র, ঘুষ খাইয়ে বের করা। কেউই আর জানে না গাড়ি চালানোর প্রকৃত আইনকানুন। যার যেমন খুশি চালাচ্ছে — তারই মধ্যে এই কচি মেয়েটাকে তুমি একা ছেড়ে দিলে — গাড়িঘোড়ার এই অরণ্যের মধ্যে! অরণ্যেও তবু আইনকানুন আছে, বন্যপশুও কিছু কিছু নিয়ম মানে — কলকাতার গাড়িঘোড়া কোনো নিয়মই মানে না — সাইকেল যে কিছুতেই কিনে দিইনি তোমাকে ছেলেবেলায়, সে শুধু এইজন্যে আর তুমিই কি না আমার অমতে — "মার বকুনি চলতেই থাকে। আমি রীতিমতো গাঢ় অভিমান বোধ করি। এ কী অন্যায় বলো দিকি, আমি যা করিনি, যে ঘটনার দায় কোনোমতেই আমার নয় — তার জন্যেও আমাকেই মা বকবেন! উলটো দিকে মন ধাইতে শুরু। অতএব :

"এমন কী আর ডেঞ্জারাস, মা ? কত ছেলেমেয়েই তো মোপেড চালাচ্ছে। স্কুটার, সাইকেল, মোপেড এসব কী লোকে চালাচ্ছে না ? আমি তো ভাবছি, পেট্রলের যা দাম বাড়ছে দিনকে দিন, এবার তেকে ওর মোপেডটা করেই কলেজে যাব। মাত্র একজন লোকের জন্যে গাড়িটা চালানো বেশি বেশি এক্সপেনসিভ হয়ে যাচ্ছে।"

মার মুখে অভাবনীয় এক স্বর্গীয় আহ্লাদের বিচ্ছুরণ ঘটে — "তুমি ? তুমি চালাবে মোপেড ? নাঃ তুমি চালালে ভালো চালাবে — রাস্তাঘাটে গাড়ি চালানো তোমার অভ্যেস আছে — সেই ভালো। মেয়েকে বরং গাড়িটা দাও, তুমিই মোপেড নাও। মেয়েটা ছেলেমানুষ, গাড়ি বড়োসড়ো জিনিস, চার দেয়ালে ঘেরা থাকবে, সাবধান থাকবে। মোপেড বড্ডই খোলামেলা, কোনো আগল-বাঁধন নেই, ধাক্কা একবার লাগল তো গেল !"

অর্থাৎ আমি গেলে মার আপত্তি নেই তত, নাতনি না গেলেই হল। গাড়ি বেশ বন্ধ দুর্গের মতো, আর মোপেড যেন অশ্বারোহী। অরক্ষিত।

"মা ? মা চালাবেন মোপেড ?"

"হ্যাঁ। আর তুমি চালাবে মার গাড়িটা।" দিম্মার সান্ত্বনা মোটেই পছন্দ হল না মেয়ের।

"না, আমার গাড়ি চালাতে ভালো লাগে না দিম্মা। গাড়ি আমার চাই না। তবে মা যদি চান মাজে মাঝে আমার মোপেডটা ওঁকে ধার দিতে আমার আপত্তি নেই, প্রোভাইডেড উনি ওটা নিয়ে কলেজে না যান।"

"কেন ? কলেজে যাবে না কেন ? কলেজেই তো যাবে। পেট্রল খরচা কমানোর জন্যে।"

"আচ্ছা দিম্মা — কী যে বলো না তুমি ?" নাতনি হেসেই আকুল। "এখান থকে যাদবপুর কতটা পেট্রল লাগে ? আর এখান থেকে সেই সেন্ট্রাল এভিনিউ কতটা। আমাকে যে গাড়ি নিতে বলছিলে, তার পেট্রল খরচটা কী ভেবেছিলে ?"

দিম্মা তাতেও অপ্রতিহত। "তুমি তাহলে মিনিবাসে যাবে। আর মা মোপেডে। আর যখন সবাই মিলে বেরুবে, তখন গাড়িও বেরুবে।"

"বারে বাঃ ! আমি বলে এত কষ্ট করে মোপেড কিনলুম, হেলমেট কিনলুম, শাড়ি-গার্ড লাগালুম, সব মিনিবাসে করে যাব বলে ! না, মোটেই না !" এবার আমাকে প্রবেশ করতেই হয়।

"আরে বাবা, আমি আগে চালাতে শিখি ! আমি তো মোপেড কখনও চড়িইনি,

চালানো দূরের কথা। চালাতে যদি পারি তবে তো নিয়ে বেরুব! কিন্তু কলেজে কেন যাওয়া বারণ সেটা শুনি?"

"কেন না আমার বন্ধুরা হাসবে।"

"হাসুক গে তোমার বন্ধুরা, লোকে অমন কত হাসে! কোনো ভালো কাজই করা যায় না লোকে কী বলবে ভাবলে। মোপেড যদি চালাতে পারি, তবে সর্বত্র যাব কিন্তু।"

"পারবে না কেন? না পারার কী আছে? খুব সোজা। অতি সহজ। গাড়ি চালানোর মতন নয়। অত রকম হাতে পায়ে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম একসঙ্গো কসরত করতে হয় না সারাক্ষণ, নাচ শেখার মতন। স্টার্টিংটাই কায়দা লাগে কেবল, একবার স্টার্ট করলে, চলতেই থাকে। প্যাডলও করতে হয় না। সাইকেলের চেয়ে সোজা। তুমি একবার দেখে নিলেই শিখে যাবে, মা। কিন্তু শিখে পেলেই আমার গাড়িটা মোনোপলাইজ কোরো না বাপু। মাঝে মাঝে চড়তে চেয়ে নিও।"

এই চেয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা আমার মনের মতো হল না। কিন্তু আমি বললুম শুধু, "আগে তো শিখি।"

"চলো না, শিখবে? এখনই শিখিয়ে দিচ্ছি।" মেয়ে উদার সুরে আহ্বান জানায়। কিন্তু আমি কোথায় একপায়ে রাজি থাকব, তা নয় আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "না, না। এখন থাক। এখন নয়। এখন ভর দুপুরবেলা, চাদ্দিকে লোকজন। সবাই দেখবে। রাত্তিরবেলা রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকবে, তখন সেফটিও বেশি। তখন শিখব। লোকে দেখলে কী ভাববে!"

"এই না বলছিলে, লোকের কথা ভাবলে জীবনে কোনো বড়ো কাজই করা যায় না?"

"এটা তো তেমন কিছু বড়ো কাজ নয়, তুচ্ছ কাজ, এর জন্য লোকের কথা ফেস করাটা নট ওয়ার্থ ইট। রাত্তিরে হবে এখন।"

হায়! রাত্তির তো হবেই। কখনও বা কখনও। হলও। মা বললেন — "খুকু, এই তো দিব্যি রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। যা এইবেলা মেয়ের কাছে চট করে মোপেড চালানোটা শিখে নে বরং।" আমারও পছন্দ হল কথাটা। বয়েস হয়েছে, মা দিনে ঘুমোন, রাতে জাগেন। মায়ের সঙ্গো সঙ্গো আমরাও অনেক রাত্তির অবধি জেগে জেগে গুলতানি করি। রাত তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। পথঘাট সত্যি ফাঁকা। বাড়ি বাড়ি আলোও নিবে গেছে। প্রতিবেশীরা নিশ্চিন্ত নিদ্রায়। কারুকে বিব্রত করার ভয় নেই। নীচে নামলুম।

সঙ্গে দুই কন্যা ও কানাই। ঝকঝকে কালো ঘোড়ার মতো নতুন তেজি মোপেড দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটো মেয়ে সাইকেল দিব্যি চালায়, কিন্তু মোপেডে নিরুৎসাহ। ("ওরে বাব্বা ও আমি পারব না!") বড়ো মেয়ে বলল — "এই দ্যাখো হ্যানডেল। এই হচ্ছে অ্যাকসেলারেটর, এই ব্রেক। দুটোই হাতে, পায়ের কিছুই নেই এতে। শুধু স্টার্টটা পায়ে করে। ওদিকে ঘোরালে অ্যাকসেলারেট করবে, এদিকে ঘোরালেই বন্ধ। এটা হচ্ছে ব্রেক। দেখে নাও। আরও এই পায়ের কাছে এইভাবে এটাতে ঝাঁকি মেরে আর হাতে এইটে টিপে এই যে দেখে নাও, স্টার্ট করতে হবে। এটা কিন্তু শক্ত। ভালো করে দেখেছ?"

"গিয়ার টিয়ার? কোন্‌দিকে?"

"নেই। এটা গাড়ি নয়। এটা আসলে সাইকেলই। কেবল মোটরে চলে। প্যাডলও আছে, তেল ফুরোলে প্যাডল করে চলে। তবে একটু ভারী লাগে, এই যা। নাও এদিকে দ্যাখো — কী দেখছে অন্যমনস্ক হয়ে? এদিকে তাকাও!"

"ওদের বাড়িতে একটা আলো জ্বলছে।"

"জ্বলুক, ওটা তো রোজই জ্বলে। ওটা ওদের সিঁড়ির আলো। স্টার্ট দেওয়ার পরে, স্ট্যান্ডটাকে এই যে, এই জিনিসটা, আগে নামিয়ে দেবে। এমনি করে। এবার গাড়িটা চলবার উপযুক্ত হল। প্রথমেই স্টার্ট দেবে, এমনি করে, বুঝেছ? তারপর — আমি আগে চালিয়ে দেখিয়ে দিই বরং — তুমি দেখে শিখে নাও। দ্যাখো এইভাবে চড়ে বসবে —" মেয়ে তো ব্লু জিন্‌স পরা, লাফিয়ে উঠে বসল। আমি যতই উচ্চে তুলি না কেন শাড়িটা, কক্ষনো ওভাবে উঠে বসতে পারব না।

"স্টার্ট দেওয়ার পর গাড়ি স্ট্যান্ড থেকে নামিয়ে সিটে বসবে, একটু পরে উঠতে হয় এতে, বুঝলে? গাড়ির মতো নয়, আগে উঠে বসে পরে স্টার্ট দেয় না — এমনি করে অ্যাকসেলারেট ....' মেয়ের গলা আর শোনা গেল না। প্রবল ভট্‌-ভট্‌ শব্দের মধ্যে দূরে মিলিয়ে গেল। দ্যাখ না দ্যাখ ওই মোড়ের কাছে পৌঁছে গিয়ে বাঁই করে ঘুরে আসছে। ফিরে এসে স্পিড কমিয়ে — "এই দ্যাখো, মা এইভাবে ব্রেক কষছি —" বলতে বলতে মেয়ে আস্তে করে থেমে গেল। অন্ধকারে অবশ্য কিছুই দেখা গেল না। কেমন ভাবেই বা সে স্টার্ট করেছিল ওই গাড়ি, কেমনভাবেই বা সে অ্যাকসেলারেট করল, আর কেমনভাবেই ব্রেক কষেছে! কিন্তু সেটা মুখ ফুটে স্বীকার করতে আমার বাধল। ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ির রকে রোজ শুয়ে থাকে এক রিটায়ার্ড ঠিকে কাজের মেয়ে, রানি, সে মহা উৎসাহে উঠে এসেছে। আর উলটোদিকের টিউবওয়েলে জল খাচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ ভিখারি —

হাতে বাটি, লাঠি, বগলে পুঁটলি। তিনিও এসে কানাইয়ের সঙ্গো বাতচিত শুরু করেছেন। দুর্গা বলে এগিয়ে যাই। প্রথমে আমি মেয়ের দেখাদেখি ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই হয় না। মেয়েই স্টার্ট দিয়ে দিল। তারপর প্রায় হাঁটু অবধি শাড়ি উঠিয়ে 'যা থাকে কপালে' বাঘের পিঠে জগদ্ধাত্রীর মতো তো অধিষ্ঠিত হলাম পাদপীঠে। পা রাস্তায়। ছোটো মেয়েটা ভীতু। সরু গলায় "ওমা? মা? পড়ে যাবে না তো?" বলে উঠল। বড়োটি সাহসিকা — "চুক্কুর্ তো। পড়বেন কেন? মা তো সাইকেল চালাতেন কলেজে। সাইকেল প্রতিযোগিতার তিন তিনটে মেডেল আছে না!"

"হ্যাঁ তা থাক, কিন্তু শান্তিনিকেতনেই সেবার তো সাইকেল চড়তে গিয়ে ধাঁই করে মা পড়ে গিয়েছিলেন, মনে নেই?"

ছোটো মেয়ের দ্বন্দ্ব ঘুচতে চায় না।

"সে অনভ্যাসের দরুন। সাঁতার আর সাইকেল কেউ ভোলে না, জানিস?"

"জানি। কিন্তু মা যে আলাদা। মা তো সেবার মহালয়ায় সাঁতার কাটতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবেও যাচ্ছিলেন; আমরা স্বচক্ষে দেখেছিলাম না? অথচ মার তো লাইফ সেভিং সার্টিফিকেট আছে দিম্মার আলমারিতে। আছে না?"

আমি আর পারি না। "ব্যাব্যাঃ— যত্তো সব বাজে কথা। হঠাৎ ডুবব কেন? শাড়িতে পা জড়িয়ে ধরেছিল তাই। আর সাইকেল যে আজকাল চড়তে পারি না সেটা তো কেমব্রিজে সেই অ্যাকসিডেন্টের পরে, সাইকোলজিক্যাল ব্লক থেকে।"

"কী অ্যাকসিডেন্ট, মা?" দুজনেই ব্যাকুল।

'ওই যে, টিউটরের কাছে যাচ্ছিলাম তো, অন্যমনস্ক হয়ে চালাচ্ছি, হঠাৎ একটা পার্কড ভিহিকলের সঙ্গো একটা থেমে থাকা লাল দোতলা বাসের সঙ্গো ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে গেলুম। আর ঠিক সেইখানেই পুলিশ ব্যাটা ডিউটি দিচ্ছিল। .... সেই থেকে কেমন ভয় ধরে গেছে। চলে আসার সময়ে আমার লাল টুকটুকে সাইকেলটা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পার্থ দাশগুপ্তকে দিয়ে এসেছিলুম। সে তখন ট্রিনিটিতে আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র। দেখা হলে জিজ্ঞেস করিস।"

"খুব হয়েছে। এখন এটা চালাও দিকি!"

"এই তো? এমনি করে তো? বেশ, একটু ঠেলে দে আগে, নইলে এগুবো কী করে?"

"ঠেলব কী গো? নিজে নিজে যাবে। স্টার্ট তো দিয়েই দিয়েছি, এবার দু-পাশে পা

রাখো, হ্যাঁ ... র‍্যাকটা তুলে নাও .... হ্যাঁ ... বাঃ, এবারে অ্যাকসেলারেট...”

বলতে না বলতেই গাড়ি তিরবেগে বেরিয়ে যায়। আমি সমেত। দু-পাশে দুই কন্যা প্রাণপণে ছুটছে, পিছনে পিছনে কানাই, তার পিছনে বাটি লাঠি পুঁটলি বগলে বৃদ্ধ ভিখিরি, তিনিও খুবই জড়িয়ে পড়েছেন এই এক্সপেরিমেন্টে। আর রানি আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা চিরে চেঁচিয়ে চিয়ার গার্লের কর্তব্য পালন করছে। চ্যাঁচাচ্ছি অবশ্য আমরা সকলেই, কিন্তু ঠিক ঐকতানে নয়। যে যার স্বকীয়তা বজায় রেখে। একেই কী বলে হার্মনি?

বড়ো কন্যা — “ঠিক হচ্ছে মা, ঠিক হচ্ছে, চলতে থাকো”—

ছোটো কন্যা — “ওরেব্বাবা মাগো পড়ে যেয়ো না যেন — দেখো বাবা! ওগো, মাগো, যেন পোড়ো না।” —

ভিখিরি বৃদ্ধ — “ওগো তোমরা সবাই থামো না একটু। — তোমরা একটু থামো দিকিনি — আমার বউদিদি ঠিকই চলে যাবে এখন, দুগগাঃ দুগগাঃ — অত কথা বললে কী আর মাথার ঠিক থাকে কাউর” —

রানি — “ও মাগো, কী হবে গো? এ কী কাণ্ড গো? বাড়ির গিন্নি যে মপেটও চালাচ্ছে গো” —

মোপেড — “ভটর্ ভটর্ ভ্যাট্ ভ্যাট্ ভ্যাট্” —

আমি — (মনে মনে ইষ্টমন্ত্র, আর মুখে)

‘ওরে ওরে নামবো যে রে — ওরে নামবো — ওরে থামবো কী করে — ওরে এটা যে থামছে না রে” —

ছুটতে ছুটতে মোপেড শিক্ষিকা দ্রুত ইন্সট্রাকশন দিতে থাকেন —

“স্পিড কমিয়ে দাও, স্পিড কমিয়ে দাও, পা মাটিতে পা মাটিতে ঠেকিয়ে দাও, মাটিতে পা ঠেকিয়ে —”

ছুটতে ছুটতে কাঁদো কাঁদো ছোটো মেয়ে — “পা মাটিতে, পা মাটিতে, ওমা গো, পা মাটিতে মা —”

ছুটতে ছুটতে কানাই — “দিদি, দাঁইড়ে পড়ুন — পা মাটিতে নাবিয়ে ফেলুন, দাঁইড়ে পড়েন — নাবিয়ে দ্যান পা-টা —”

ছুটন্ত ভিকিরি — “বউদিদি আপনিই লেবে পড়বে — তোমরা আর ওকে ঘাবড়ে

দিওনি — বউদিদি আপনিই লেবে যাবে'খনি — তোমরা চ্যাঁচানি থামালিই উনি লেবে পড়বে —”

উচ্চকিত রানি — “আর উদিগে যেয়ে কাজ নি গো দিদিমুনি — ঢের হয়েচে — উদিগপানে আর যেয়োনি — উদিগে গোরু — গুঁতিয়ে দিবে, উদিগে গোরু” —

— আর 'যেয়োনি'! হুঁ, যেতে তো পড়েইছি। এক্কেবারে খাটালের সামনে। ফুটপাথের ওপরে গোল হয়ে বসে নিরীহ বিহারি গয়লারা ঢোলক বাজিয়ে গলা ছেড়ে ভোজপুরি রামাহো গাইছিল :

—“রোয়ি রোয়ি পাতিয়া — লিখল্‌বা রজমোতিয়া — আররে রোয়ি রোয়ি” —তারা প্রাণের আনন্দে আর ঢোলের শব্দে আমার প্রাণঘাতী ভ্যাট্ ভ্যাট্ শুনতে পায়নি। সহসা উদিত হয়ে তাদের জলসা থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে ঠাস করে গাড়িটাকে ফেলে দিয়েই সার্কাসের কায়দায় সাড়ে তিন হাত লম্ফ দিয়ে ওদের উলটোদিকে নেবে পড়লুম। সেও চমৎকার স্পেস সেন্সের প্রমাণ দিয়ে, গোবর গাদা থেকে আধ মিলিমিটার তফাতে। গাড়ি প্রপাত, গয়লারা অনাহত, আমিও অনাহত। সবাই ঠিকঠাক। শাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবলুম — “অনেকটা সাইকেলের মতোই” — ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার রেজিমেন্ট এসে পড়েছে। বীরগর্বে বলি — “বেশ সোজা। ঠিকই বলেছিলি, অনেকটা সাইকেলের মতোই।”

বড়ো মেয়ে (সস্নেহে)— “দেখলে তো? এই তো বেশ চড়তে পেরে গেলে। গুড!”

বৃদ্ধ ভিখিরি — “কিন্তু বউদিদি অত ডাইনে বাঁয়ে প্যাঁচ কষছিলেন ক্যানে? সিধে যেতে পারেন নাকো? সিধে যাওয়াই তো ভালো।”

কানাই (সগর্বে) — “আরে একটু প্র্যাকটিস কলিলিই সিধে যেতে পারবেন — ব্যালান্সটা এসে যাবে — প্রেথম বারেই দিদি প্রায়ই শিখেই ফেলেছেন” —

ছোটো মেয়ে (সভয়ে) — “থাক্ আর শিখে কাজ নেই। এই পর্যন্ত থাক। মা আর-একটু হলেই গয়লাদের চাপা দিয়ে দিচ্ছিলেন। নিজেও গোবরগাদাতে পড়ে যাচ্ছিলেন, অল্প একটুর জন্যে, নেহাৎ বাই চান্স —”

রানি (দূর থেকে, অদশ্য দেবতাদের নমস্কার করে) — “দুগ্‌গা — দুগ্‌গাঃ! অ বড়োদিদি ছোড়দিদি তোমাদের মা জননীকে এবার ডাকো— ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিইরে নে এসো বাছারা — আর মপেট চালিয়ে কাজনি গো মায়ের — ঈ কী পেহার” —

বাইরে রাজ্যজয়ের মতো মুখের ভাব হলেও আমার বুকের ভিতর দুরু-দুরু। সেই যে দোলনচাঁপার খুদে ছেলেটি বম্বেতে একটা সরু সাঁকো পার হতে হতে বলেছিল না, — "আই অ্যাম নট অ্যাট হল অ্যাফ্রেইড, — কিন্তু মনে মনে বিসোন ভয় —" ঠিক সেই অবস্থা।

গয়লারা তো গানবাজনা বন্ধ করে প্রাণভয়ে, 'হায় রাম!" বলে ঢোল ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। গোরুগুলো নেহাত খোঁটায় বাঁধা, কিন্তু তারা বহুদ্রষ্টা প্রাণী, ঠিকই বুজেঝে একটা কিছু ভয়ংকর কাণ্ডকারখানা সংঘটিত হতে চলেছে। একটা বেয়াড়া বাছুর ভয় পেয়ে গিয়ে আকস্মাৎ গলা ছেড়ে কেঁদেই উঠল — "হাম্বু-উ-উ" ... কী অলুক্ষুণে গোরু রে বাবা।

নাঃ। এদিকটাতে সত্যিই আর প্র্যাকটিস করা যাবে না দেখছি। ইতিমধ্যে আমাদের দলে রাস্তা থেকে আরও একজন কর্তাব্যক্তি, এ পাড়ার প্রহরী সারমেয়টি এসে যোগ দিয়েছেন। তিনি সবলে সরু ল্যাজ নেড়ে নেড়ে উৎসাহ দিচ্ছেন, আমি আত্মস্থ পদক্ষেপে, স্থিতধী স্টাইলে মোপেডটি হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছি, সঙ্গী সারমেয়ও ধীরপদে সঙ্গো সঙ্গো হেঁটে আসছেন, মহাপ্রস্থানের স্মৃতি মনে না পড়ে উপায় নেই।

সে যাই হোক, এদিকটায় আর নয়। এবার বরং পূর্বদিকে, মাননীয় জ্যোতিবাবুর বাড়ির ওদিকটায় যাই। ওখানটায় খাটাল নেই, গয়লা নেই, গোবর নেই, গোরু নেই, বাছুর নেই। শুধু ঘুমন্ত পুলিশ আছে কিছু। কেন-না, ওখানে জ্যোতিবাবুও নেই।

যেমনি ভাবনা তেমনি কাজ। আমাদের বাড়িটা যেহেতু তিন মাথার মোড়ে, তাই সম্ভাবনা বহুমুখী। পশ্চিমে আর নয়, এবার পুব-দক্ষিণে। ও মোড়েই পৌঁছেই, হু-উ-শ — সামনে টানা ফাঁকা রাস্তা ... চালাও পানসি বেলঘরিয়া। স্টিয়ারিং হ্যানডেল এবার ডাইনে বাঁয়ে নয়, নাকের সিধে। এবারেই পারফেকশনে পৌঁছে যাব। চমৎকার রাস্তা। একদম ফাঁকা।

কিন্তু এ কী হল, হঠাৎ? বাপ্‌রে। মরে গেলুম, মরে গেলুম! ছ্যাঁক করে পায়ের ডিমে একটু গরম আগুনের ছ্যাঁকা কে যেন লাগিয়ে দিলে! ওমনি আপনা আপনি হাত কেঁপে উঠে অ্যাকসেলারেটর ঘুরিয়ে ফেলেছি ছ্যাঁকার চোটে, সঙ্গো সঙ্গো স্বয়ংক্রিয় রোবটের স্টাইলে লাফিয়ে উঠে জ্যামুক্ত তিরের মতো নাকের সোজা ছুটল আমার সপ্ত-ঘোড়ার বাহন, একেবারে পুষ্পকরথের মতো — মাটিতে না আকাশ পথে তাও ঠিক বুঝতে পারছি না — কানে এল পরিত্রাহি চিৎকার — সবার ওপরে আমারই গলা :

আমি — "আমি নামবোঁ, ওরে আমি নামবোঁ।" ...

ছুটন্ত বড়ো কন্যা — "ব্রেক, ব্রেক, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেলারেটরটা উলটো দিকে ঘোরাও — ব্রেক, ব্রেক।"

ছুটন্ত ছোটো কন্যা — "অ মা মাগো, নেমে পড়ো মা, ব্রেক দিয়ে দাও মা, ব্রেক — মা গো, অ মা" —

ছুটন্ত কানাই — "ব্রেক ডান হাতে, অ দিদি, ব্রেকটা ডান হাতে, দিদি, ব্রেক ডান হাতে।" —

ছুটন্ত ভিখিরি — "ওরে মুখপোড়া, তুই থাম না রে, বউদিদি ঠিকঠাক বেরেক মারবে, তোমরা থামলিই বেরেক মারবে, তোদেরকে চেঁচাতে হবে না ব্যাটারা" —

বাড়ির সামনে দণ্ডায়মান রানি — হায় হায় হায় — হয়ে গেল! এইবার ঠিক সব্বোনাশ হবে গো — হে মা দুগ্‌গা— হে মা দুগ্‌গতিনাশিনী — রক্ষে করো মা —"

ছুটন্ত কুকুর — 'ঘৌ ঘৌ ঘৌ ভৌ ভৌ ভৌ ছৌ ছৌ ছোঃ ছোঃ"

উড়ন্ত আমি — "ওরে, এ যে থামচে না রে — ওরে এ যে থামচেই না —"

ছোটো কন্যা — "হে ভগবান" —

ভাগবান শুনতে পেলেন। করি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ি 'ইলাবাস' আর শিল্পী সুনীলমাধব সেনের বাড়ির মাঝ বরাবর ভগবান প্রচুর বালি ঢেলে রেখেছিলেন। যেন আমারই প্রতীক্ষায়। পাখির মতো উড়ে গিয়ে আমার মোপেড সেই ঐশ্বরিক বালুকাবেলায় সজোরে ঢুকে পড়ল। মোপেড সুদ্ধু আমি বালির মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে গেলুম। চমৎকার চাঁদনি রাত। বালিতে শুয়ে শুয়ে মাথার ওপর চেয়ে দেখলুম চাঁদের মুখখানা হাসি হাসি। নক্ষত্রের শয়ে শয়ে চোখ টিপুনি। কী গো? কেমন হল? লাগল কেমন? বেশ ভাই!

ততক্ষণে পাড়ার সবগুলো বারান্দাতেই আলো জ্বলছে। একটা অডিয়েন্স তৈরি হয়ে গেছে। প্রতিবেশীরা সবাই বাইরে। শুধু পুলিশেরা ভিতরে। সার্কাস দেখার উত্তেজনা বাতাসে খেলে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকেই উত্তপ্ত, প্রত্যেকেই বিজড়িত, প্রত্যেকেরই একটা পয়েন্ট-অব-ভিউ আছে। দীপঙ্করটা থাকলে একটা ওপিনিয়ন পোল নিয়ে নিত — ভাগ্যিস সে ব্যাটা অনুপস্থিত! পড়শিরা সকলে যার যতটুকুন সাধ্য উদ্দীপনা জোগাচ্ছেন — সেই যখন একটি ছেলে ওই কেয়াতলার মোড়ে সাত দিন টানা সাইকেল চালাবে বলে ঘোষণা করে তিন দিন একটানা সাইকেল চালিয়েছিল — ঠিক তেমনি টেন্‌স আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। উত্তেজনায় উলটো সিগারেট ধরিয়ে সামনের বাড়ির দাদা বলছেন —

"পিকো, তোর মাকে চার চাকাতেই মানায় ভালো।" — নাইটির ওপর হাউসকোট চড়িয়ে বউদি বলছেন, "টুম্পা, মোপেডটা মাকে ধরতেই দিস না।" বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াই। চতুর্দিকে সহানুভূতি চাঁদের আলোর মতো বয়ে যেতে থাকে।

"কী খুকুভাই? লেগেছে নাকি?"

"একটু আধটু না পড়লে হয়? জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার, সাইকেল শেখে না কেহ না খেয়ে আছাড়" ....

"ঘাবড়াস না রে খুকু, আর ক-টা দিন প্র্যাকটিস করলেই তুই ঠিক তোর মেয়ের মতন চালাতে পারবি —"

"ও কিছু না, লেগেছে ভাবলেই লাগবে — মনে কর পড়িসনি।"

কুকুররূপী মহাত্মা বললেন — "নারদ নারদ লাগ্‌লাগ দুরদুর ভাগ্ ভাগ্ ভো ওউ যাও যাও ঘরের মেয়ে ঘরে আও।" লাঠি-বাটি-পুঁটলি সামলে কানাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়েছেন বৃদ্ধ ভিখিরি। আমার এই পাবিলিক রথস্খলনে তিনি যারপরনাই বিমর্ষ। আমার মোপেড প্রশিক্ষণের যৌথ পরিশ্রম তো কম ক্লান্তিকর ছিল না। তিনি এখন কানাইকে ডেকে বলছেন —"ভাইটি একটু টিউকলটা পাম্প করে দেবে? টুকুনি জল খাব।" দিদির কীর্তিতে সলজ্জ, নির্বাক কানাই, হাঁটু অবধি প্যান্ট গুটোনো। আমার মেয়ের মোপেড ঠেলে নিয়ে আসছে। দুই মেয়ে দুই পাশে ঘন হয়ে লেপ্টে এসে দুই কানে গুনগুন করে বলছে, "বেশি লাগেনি তো? মাগো? বেশি লাগেনি তো?" আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি না খুঁড়িয়ে, সহজভাবে এবং গ্রেসফুলি হেঁটে বাড়িতে ঢুকে পড়তে। কপিলদেব ক্যাচ লুফে আউট করে দেওয়ার পর ইমরান খান যেভাবে আস্তে হেঁটে সেদিন প্যাভিলিয়নের দিকে আসছিলেন, (আহা আউট হয়েও কী গ্রেস, কী পয়েজ) — অনেকটা সেইভাবে একদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে স্টাইলিশভাবে পা ফেলবার চেষ্টা করছি — পথের দু-পাশে চেনা-অচেনা উৎসাহী দর্শককুলের গার্ড অব অনারের মাঝখান দিয়ে। কিছু সদ্যোস্নাত রিকশাওয়ালার পাশাপাশি গয়লারাও ও মোড় থেকে হেঁটে এ মোড়ে চলে এসেছে, তামাশা দেখতে। এমনকি মহামান্য পুলিশরাও আড়মোড়া ভেঙে উঠে এসেছেন। কেবল গোরুগুলোই যা খোঁটা উপড়ে ছুটে আসতে পারেনি।

কান গরম, পা জ্বলে যাচ্ছে, কোনোরকমে যেন কিছুই হয়নি ভাব করে বাড়িতে এসে পৌঁছেই কাতরে উঠলুম — "বার্নল! বার্নল! আমারপা পুড়ে গেছে।'

"পা পুড়ে গেছে? সেকি? রাতদুপুরেও বালিটা গরম ছিল না কি?"

"কেটেকুটে যায়নি, পুড়ে গেল ? সে আবার কী ?"

রানি কপাল চাপড়ে বলল — "পুড়বেনি ? পুড়বেই তো ! কলিকাল ! দিনে দিনে আরও কত কী চোক্ষে দেখব কে জানে ?"

কানাই বড়ো শান্ত ছেলে। ইতিমধ্যে গাড়িটা পরীক্ষা করে খুব গরম একটা জায়গা বের করেছে যেটা চামড়াতে ঠেকলে ছ্যাঁকা লাগবেই লাগবে। কিন্তু সেখানটা মোটেই চামড়াতে ঠেকার কথা নয়। আমার চড়ার গুণেই ঠেকে গেছে। কানাইয়েরও কখনও ছ্যাঁকা লাগেনি, পিকোরও না। ওরা তো দিব্যি নিরাপদে চালিয়েছে ! ওদের নিঃশব্দ হাস্য অগ্রাহ্য করে মার কাছে চলে এলুম খোঁড়াতে খোঁড়াতে। মা ঘরবন্দি মানুষ। বারান্দায় বেরুতে পারেন না। ওদিকে রাস্তায় যে কীদৃশ নৈশবিপ্লব ঘটে যাচ্ছে মা কিছুই টের পাননি। এক মুখ উজ্জ্বল হেসে মা আমাকে রিসিভ করলেন।

—"আয়। বোস। হল শেখা ?"

— "ওই একরকম।"

— "পারলি চালাতে ?"

ঠিক এমন সময়ে কানাই এসে বলল :

— "দিদি, বার্নল।"

— "বার্নল ? কেন রে বার্নল কী হবে ?"

—"পা পুড়ে গেছে দিদির।"

— "খুব লেগেছে, না মা ? দেখি দেখি —"

— "আশ্চর্য ! আমরাও চড়ি, কখনও পা পোড়ে না, তুমি পোড়ালে কেমন করে বলো তো ?"

— "পা পোড়ালি কি না গাড়ি চালাতে গিয়ে ? একি রান্নাবান্না ? আশ্চর্য মেয়ে বাপু !"

— "ওই মোপেডের এগজস্ট পাইপে ছ্যাঁকা খেয়ে গেছেন।"

—"সেকি রে ? খুকু ? সত্যি।" কন্যার গাড়ি চালানোর চমৎকারিত্বে অপরিসীম বিশ্বাসী মা-বেচারির দুই চোখে বিস্ময়-বিস্ফারিত বেদনা। অর্থাৎ মার চোখ বলছে — "অ্যাদ্দিন কলকাতা শহরে গাড়ি চালিয়ে শেষে কিনা এ-ই ?" গাড়ির এগ্‌জস্টপাইপ থেকে যে পায়ে ছ্যাঁকা লাগতে পারে না মাকে সে ব্যাপারটা বোঝাই কী করে ?

—"বেশ লাগেনি। একটুখানি ফোস্কা।" লজ্জিতভাবে বলি।

— "দেখি, দেখি ? ও ব্বা ! এ যে অনে — কখানি রে ?" মা কিছুক্ষণ বিমর্ষভাবে চুপ করে থাকেন। মেয়েরা সযত্নে বার্নল লাগিয়ে দেয়। মা দ্যাখেন। ফার্স্ট এড শেষ হলে, মা ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন। আমি তাড়াতাড়ি বলি — "ফোস্কাটা সেরে গেলেই আবার" —

— "থাকগে, যাক্‌গে। ও আর হল না। তোমার আর মোপেড চালিয়ে কাজ নেই মা, তুমি তোমার চার চাকার যন্ত্রর নিয়েই থাকো। পিকো যেটা পারে, তুমিও সেটা পারবে, আমি এইটে ভেবেছিলুম।" মা মর্মাহত। অক্ষম সন্তানের উচিত সংকোচেই আমি অনেকখানি মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকি। সত্যিই তো। পারিনি। মোপেড আমি চালাতে পারিনি। তবু সাহস করে বলে ফেলি :

— "পায়ে ছ্যাঁকাটা যদি না লাগতো মা—"

—"পিকোর কি ছ্যাঁকা লেগেছিল ?"

— "ও তো জিন্‌স পরে।"

—" তোমাকে জিন্‌স পরতে কে বারণ করেছিল ? যে দেবতার যা মন্তর।"

— "যাঃ বাবা ! মোপেডের জন্যে জিন্‌স পরে শেষে যাদবপুরে ? থাক মা, আমার ভাঙাচোরা গাড়িটাই ভলো।"

পরদিন কলেজে যাব, গাড়ি বের করছি। রানি রকে বসে মুড়ি খাচ্ছে।

আমাকে দেখে হেসে হেসে চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বলল :

—"এই তো দিব্বি মাইনেচে এবারে। বলি পায়ের সেই ফোস্কাটা আজগে আচে কেমনি ? বুইলেনি গা দিদিমুনি, ঝার কম্মো তারে সাজে অন্যঝনের নাঠি বাজে। ঝে বয়সের ঝা।"

গোলাপি ঘর

বাণী বসু

আমরা খুব খু-উব দুষ্টুমি করলে আমাদের মা একটা অদ্ভুত ধরনের ভয় দেখাতেন আমাদের। ধরুন কিছুতেই আমাদের দস্যিগিরির সঙ্গে পেরে উঠছেন না। স্কুলের টাস্‌ক করেছি আধ-খামচা, কোনো কথা শুনছি না, বাড়ির বেচারি স্প্যানিয়েলের গায়ে টিউবের রং গুলে বেশ করে লাগিয়ে দিয়েছি, কিংবা পাশের বাড়ির মাথায়-ছিট ঝড়ুকাকার পিছনে লেগেছি। ঝড়ুকাকা রেগে মেগে নালিশ করছেন আর আমরা একটুও অনুতপ্ত না হয়ে হাসাহাসি করছি। এই রকম বাঁদরামি করলে তবেই মা ভয়টা দেখাতেন।

হঠাৎ আমাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। মুখটা ওপরে তুলে ধরলেন — যেন শূন্যে। ঘরের মধ্যেই কেউ আছে, যে মায়ের কাছে দৃশ্য কিন্তু আমাদের কাছে অদৃশ্য।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আসছি। হ্যাঁ এবার আর দেরি নয়। একটু অপেক্ষা করো, জিনিসপত্রগুলো স্যুটকেসে ভরে নিই .... কী বললে? দরকার হবে না?" একটু ম্লান হাসি ... তারপর .... 'অবশ্য আমার যা যা লাগবে সেসব তো তুমি দেবেই। কেন বিশ্বাস করব না? আরে! হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ ওই সময়েই ভালো। নিশ্চয়! ফিরব না। ফিরব কেন?"

ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝতে পারতুম না। ঠিক যেন একটা টেলিফোনে কথা হচ্ছে। ল্যাজের দিকেরগুলো শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু মুড়োর দিকটা পাচ্ছি না। যতই কান খাড় করি।

আমরা একেবারে জড়োসড়ো হয়ে যেতুম ভয়ে। সিঁটিয়ে যেতুম।

তারপরে মা উঠে দাঁড়াবেন। চারদিকে তাকাবেন যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। আমাদের ওপর দিয়ে চোখ চলে যাবে, অথচ আমাদের দেখবেন

না। যেন এই ঘরের মধ্যে একটা অন্য ঘর জেগে উঠেছে। অন্য পৃথিবী। মা চলতে আরম্ভ করবেন, যেন ঘুমের মধ্যে চলেছেন।

এইবারে ভয়ে আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হতে থাকবে। দুজনে দুদিক থেকে ছুটে গিয়ে মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধর। 'কোথায় যাচ্ছ? ও মা!— কোথায় যাচ্ছ। আমাদেরও নিয়ে যাও।'

"কিন্তু ওখানে তো তোমাদের যেতে দেবে না", — মা বললেন যেন কেমন ঘোর লাগা গলায়।

তাহলে তুমিও যেয়ো না। তুমি যাবে না। কিছুতেই না।

কিন্তু তোমাদের তো আর আমাকে দরকার নেই। কী করা উচিত না উচিত, কী খাবে না খাবে, কী রকম ব্যবহার করবে না করবে — সবই তো তোমরা জেনে গেছ! তা ছাড়া তোমরা তো আমাকে ভালো বাসছ না আর। যেসব ছেলেমেয়েরা মাকে ভালোবাসে তারা মা যা ভালোবাসেন সেইসব করে। যা বলেন তাই। যদি নিজের ভালো না লাগে তাও। শুধু মা খুশি হবেন বলে।

আমরাও তাই করব। তুমি যা বলবে তাই। আমাদের যদি লক্ষ্মী হতে ভালো না লাগে তাও লক্ষ্মী হব। ঝাড়ুকাকার কানের কাছে ঠোঙা ফাটাব না, ভুলোর গায়ে রং দেব না। দাদার চোখ ছলছল, আমার চোখ জ্বালা করছে কান্নায়।

মা যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠবেন, "হ্যাঁ, আজ যেতে পারছি না। না না ওরা লক্ষ্মী, ভালো হয়ে যাবে বলছে। শুনতে পাচ্ছ তো! হ্যাঁ, যাব তো বটেই। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করো। ওদের এখনও আমাকে দরকার — বলছে। ওরা কথা দিচ্ছে, আচ্ছা এবারটি ওদের মাফ করো।"

এরপর মা আবার আগের মা। আমাদের সঙ্গে খেলছেন। আলিবাবার গল্প বলছেন, গান করছেন। এইসব সময়ে মা আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরতেন, এমন শক্ত করে যেন মা নয়, আমরাই কোথাও চলে যাব বলে ভয় দেখিয়েছি। কেমন গা ছমছম করত, কিন্তু বুঝতে পারতুম মা আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে আছেন। যেমন নরম পশমের কম্বলের মতো ওম-অলা সেই ভালোবাসা। নিবিড়, নিখাদ। আর সেই সময়গুলোতে আমরা যেন মায়ের হয়ে যেতুম, একলা মায়ের। আর কারও নয়। অনুভব করতুম মায়ের অনন্ত দুশ্চিন্তা, অনন্ত উম্নতা, গভীর

আবেগ। সমস্ত জিনিসটা যেন বাস্তব জগরে নয়, কোনো ভাবজগতে ঘটছে। একেবারেই বিমূর্ত।

অন্যান্য সময়ে শত কৌতুহল সত্ত্বেও কিন্তু আমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে মায়ের সঙ্গো স্পিকটি নট। যদি আবার মনে পড়ে যায় ... যদি আবার সেই রকম, ... উঃ। না। একেবারেই না। কিন্তু নিজেদের মধ্যে জল্পনা চলত মাঝে মাঝেই।

কার সঙ্গো মা কথা বলেন বলত!

নিশ্চয়ই বন্ধু-টন্ধু হবে। ম্যাজিক জানে তাই অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু আমরা তো ওর গলা, কথা, কিছুই শুনতে পাই না।

দাদা বিজ্ঞের মতো বলত, আমরা ছোট তো! আমাদের কান মায়ের মতো নয়। বড়ো হলে কানের জোর বাড়বে তখন ঠিক শুনতে পাবো লোকটার গলা।

কিন্তু তুই ধরে নিচ্ছিস কেন ওটা একটা লোক! মেয়ে নয়!

এ কথার জবাব আমরা কেউই দিতে পারতুম না। কেমন যেন মনে হত, ও বিরাট কেউ, শক্তিমান, লম্বা-চওড়া — মেয়ের অমন হয় না।

একদিন কিন্তু দাদা মুখ কালি করে স্কুল থেকে ফিরল। একটা কোণে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বলল, আমি জেনে গেছি।

কী?

মা কার সঙ্গো কথা বলেন।

কে? — আমার গলা কাঁপছে।

মৃত্যুর দেবতা, যম।

ঝগড়া-টগড়া ভুলে আমরা দুজন দুজনকে আঁকড়ে ধরলুম।

কিন্তু এই মৃত্যুর দেবতা কী মানুষের সঙ্গো কথা বলে? বলতে পারে?

বলে। বলেছে। সাবিত্রী বলে একজন মেয়ে, আর নচিকেতা বলে একটা ছোট্ট ছেলের সঙ্গো বলেছে। আজই স্যার সেই গল্প করছিলেন আমাদের ক্লাসে।

ভয়ে আমরা আধমরা — যদি যমরাজের সঙ্গো মায়ের এতই জানাশোনা, যখন তখন কথা বলাবলির সম্পর্ক, তবে তো যে-কোনো মুহূর্তে মা ওর কাছে চলে যেতে পারেন। ও-ও তো ডেকে নিয়ে যেতে পারে মাকে। কিন্তু একটা

আমাদের করতেই হবে। আটকাতেই হবে। ঠিক আছে মা বিরক্ত হন এমন কিছু আর আমরা করব না। ভালো হয়ে থাকব।

চলে কিছুদিন। তারপর একদিন আবার সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। আমার হাতে দাদার চুলের মুঠি, দাদা আমাকে বেধড়ক মেরে যাচ্ছে। আমি ওকে আঁচড়ে দিচ্ছি, ও আমাকে কামড়ে দিচ্ছে। মা আমাদের ছাড়াবার চেষ্টা করছেন, "মিঠু মিঠু। চুল ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি। তোমার দাদা হয় না? কান মুলে দিচ্ছ কি দাদার? রনি, ছি ছি, অমন করে মারছ কেন? মিঠু তোমার ছোটো বোন না? তোমরা কী বাচ্চা না রাক্ষস?"

কিন্তু তখন দুজনেরই মাথায় রাগ চড়ে বসে আছে। থামব না। আমরা কিছুতেই থামব না।

এমন সময় দেখি, মা নিথর হয়ে যাচ্ছেন, ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের, মুখ ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি।

'কেন? কেন আমার ছেলেমেয়ে এত নিষ্ঠুর? কেন ওরা এত মারামারি করে? বলো, বলো আমাকে, বলো। .... ও, বুঝেছি ওরা আমায় ভালোবাসে না। ভাই বোনকে, বোন ভাইকে কেউ কাউকে ভালোবাসে না। কিন্তু কেন? আমি তো ওদের মা! মাকে কি ভালো না বাসা ......'

কিছু যেন শুনলেন, তারপর বললেন, "ও বুঝেছি। মা-টা কিছুতেই কিছু আসে যায় না। ভালোবাসে না তো ভালোবাসে না — এর কোনো কেন টেন নেই। যাব ... কিন্তু ওদের ওপর আমার কিছু কর্তব্য তো এখনও রয়েই গেছে।"

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, "মা! তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?" — আমার গলা কাঁপছে।

ওসব তোমরা বুঝবে না।

দাদা গোঁয়ারের মতো বলল, "আমি জানি। আমরা বুঝি।"

"কী বুঝিস?" মায়ের গলায় কি সামান্য কৌতুক?

"তুমি যমের সঙ্গে কথা বলো। দিনরাত ও তোমায় ডাকাডাকি করছে। আর তুমি চলে যেতে চাইছ। মানে মরে যেতে চাইছ! খারাপ মা! বিচ্ছিরি মা।" — বলতে বলতে দাদা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। আমিই বা বাকি থাকি কেন? — ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি।

দেখি মা যেন অস্বস্তিতে পড়েছেন। ঘাবড়ে গেছেন।

আরে না, না, কে বলেছে তোদের ওটা যম? দূর একদম ভুল।

ভুল না আরও কিছু। ও তোমাকে নরকে নিয়ে যাবে। বিরাট কড়ায় গরম তেলে ছ্যাঁক ছোঁক করে ভাজবে। সুদ্ধু, সুদ্ধু আমরা দুষ্টমি করেছি বলে। বাজে লোক, বদমাশ।

সে কী রে? ও আমাকে ঠিক তোদেরই মতো ভালোবাসে। নরকে নিয়ে যাবে কেন? নরক বলে কিছু আছে না কি? যত্ত ভুলভাল ভাবছিস।

তাহলে কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবে তোমায়?

মা যেন দেয়াল ভেদ করে অন্য কোনো দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন। ধ্যানস্থ। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক, ভারি নরম একটা হাসির মতো কিছু খেলা করছে ঠোঁটে।

"গোলাপি ঘর।"

"গোলপি ঘর? কোথায়?" আমরা আশ্চর্য হয়ে সমস্বরে বলি।

কোথায় তা জানি না। জানার দরকারও নেই। ঘরটা আগাগোড়া গোলাপি। ব্যাস। খুব বড়োও নয়, খুব ছোটোও নয়। ইচ্ছে করলে তোমার দরকার মতো বাড়িয়ে নিতে পারো। ছোট্ট সুন্দর ঘরখানা। একদিকে সিঙ্গাল খাট, তাতে গোলাপি চাদর, গোলাপি বালিশ। আর জানলা-দরজার পর্দাগুলো গোলাপিই কিন্তু একটু গাঢ়, ধরো ম্যাজেন্টা ম্যাজেন্টা। মেঝেতে একটা গোলাপি কার্পেট, তাতে গাঢ় গোলাপির ফুল লতা পাতা বোনা।

"চেয়ার-টেবিল? সেগুলোও গোলাপি?"

"না, সেগুলো গোলাপি নয়। তবে এমন চকচকে আয়নার মতো পালিশ যে ঘরের সব গোলাপির ছায়া পড়ে পড়ে গোলাপিই মনে হয়। আর আছে একটা ম্যাজেন্টা শেডওয়ালা টেবিল-বাতি। জ্বাললে এত সুন্দর হয়ে যায় না ঘরখানা। চমৎকার একেবারে।" .... মার মুখে দিব্য আলো।

কী করে খাবে ওখানে?

কোনো ব্যাপারই না। একটা ছোট্ট রান্নাঘরও তো আছে, সেখানে গোলাপি ভাত-ডাল আর-একটা সেদ্ধ কিছু করে নেব, তারপর গোলাপি কাচের প্লেটে করে খেয়ে নেব। তোরা তো জানিস আমার তোদের মতো খাওয়ার ল্যাঠা নেই।

"আর মাছ? আর উচ্ছে।" আমি বলে উঠি, আমার চোখ এইবারে চিকচিক করছে। মা যে আমাদের বিচ্ছিরি-লাগা এই দুটো জিনিস ভীষণ ভালোবাসেন। আর কী হবে?

"সে যদি ইচ্ছে হয়, ঠিক এসে যাবে।" — মা নিশ্চিন্তে উত্তর দেন।

"আমরাও যাব মা, আমাদেরও নিয়ে চলো। আমাদেরও," — গোলাপি ঘরের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আমরা বলি।

"কিন্তু ওখানে তো ছোটোদের, ছোটোদের কেন, কাউকেই নিয়ে যাওয়া যায় না। ও ঘর শুধু আমার, একা আমার। ওখানে কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, দুঃখ নেই। খালি গান, নদী, পাহাড়, জঙ্গল, সবুজ মাঠ।...."

এইবারে ধরে ফেলেছি। আমাদের সঙ্গে চালাকি, না?

বলি, এই যে বললে একটা ছোট্ট ঘর। ওর মধ্যে পাহাড়, জঙ্গল, মাঠ, নদী এসব ধরবে কী করে? স-ব মিছে কথা।...

মায়ের অঙ্গ থেকে এখন রহস্য ঝরে ঝরে পড়ছে, মুখে একটা আবিষ্ট হাসি। বললেন, "বুঝতে পারছিস না মিঠু। ওইটেই তো ম্যাজিক ঘরটার। তুমি যা-যা চাও, যা-যা ভালোবাসো সব, স-ব ওখানে পাবে।"

আমরা যখন বড়ো হয়ে যাব, অনেক বড়ো, তখনও ওখানে যেতে পারব না?

নিশ্চয়ই পারবি। কিন্তু সেটা অন্য ঘর। ঘর আকাশ-নীল, কিংবা কচি কলাপাতা বা পেস্তার মতো সবুজ, হাতির দাঁতের মতো বা খুব হালকা বেগুনিও হতে পারে। কিন্তু গোলাপি ঘরটা শুধু আমার, একা আমার। ওই রংটা, আমার নিজস্ব রংটা আর কোথাও লাগানো যাবে না। ওই ঘরটাতেও কাউকে নিয়ে যাওয়া যায় না।

"ছেলেমেয়েকেও না!"

"না।"

আমরা বিমর্ষ মুখে চুপ করে যাই। একটু পরে মিয়োনো গলায় জিজ্ঞেস করি, "ও লোকটা কে, যার সঙ্গে তুমি কথা বলো?"

কিন্তু যতবার জিজ্ঞেস করি, মা শুধু আমাদের বুকের মধ্যে টেনে আদর করেন, চুমো খান, উত্তর দেন না।

আজ এতদিন পর, বহু রুক্ষ বছরের ভয়ংকর লড়াই, ভয়ংকরতম যন্ত্রণা, একটা গোটা জীবন-ভরতি বিদ্বিষ্ট মুখপ্রবাহ এবং প্রাণ-অবশ-করা লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে পথ চলবার পর, মা যখন আর ইহজগতে নেই, যখন আমি আমার সেই নীল ঘরটা পেয়ে গেছি — আকাশের মতো নীল ঠিক যেমনটি মা বলেছিলেন, যখন জেনে গেছি এই ঘর ইচ্ছে করলেও কারও সঙ্গো ভাগ করে নেওয়া যায় না, তখন অর্থাৎ এখন বুঝতে পারি মা কার সঙ্গো অমন কাতর ভরসায় কথা বলতেন। দেবতা ঠিকই মৃত্যুর নয়। জীবনের।